কঙ্কগড়ের কঙ্কাল

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল

কঙ্কগড়ের
কঙ্কাল

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুব মন দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন। ছেঁড়াখোঁড়া মলাট। পোকায় কাটা হলদে পাতা। নিশ্চয় কোনও পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই। কিন্তু শেষ মার্চের এই সুন্দর সকালবেলাটা গম্ভীর মুখে বই পড়ে নষ্ট করার মানে হয়? দাঁতে কামড়ানো চুরুট কখন নিভে গেছে এবং সাদা দাড়িতে ছাইয়ের টুকরো আটকে আছে। একটু কেসে-ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। ধ্যান ভাঙল না। আমার উলটো দিকে সোফায় বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই উসখুস করছিলেন। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে আনমনে বললেন, "যাই গিয়া!"

এতক্ষণে কর্নেল বই বন্ধ করে বলে উঠলেন, "হালদারমশাই কি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?"

হালদারমশাইয়ের দুই চোখ গুলি-গুলি হয়ে উঠল। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, নাহ্। "ক্যান?"

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। "জয়ন্ত তুমি?"

"নাহ্।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি একবার জেবলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সমস্যা হল, আমাকেও কেউ এই প্রশ্ন করলে আমিও সোজা নাহ্ বলে দিতাম। কিন্তু অসংখ্য মানুষ প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি। কাজেই তারা এই বিশ্বাসের বশে এমন সাংঘাতিক-সাংঘাতিক সব কাণ্ড করে বসে কহতব্য নয়।"

হালদারমশাই উত্তেজিত ভাবে বললেন, "কেডা কী করল?"

কর্নেল হাসলেন। "করল নয়, করেছিল। ভেবে দেখুন হালদারমশাই। ১০৮টা নরবলি।"

"কন কী। পুলিশ তারে ধরে নাই?"

"পুলিশ এ-রহস্য ভেদ করতে পারেনি। যিনি পেরেছিলেন, তিনিই এই বইটা লিখে গেছেন।" কর্নেল বইটার পাতা খুলে দেখালেন। "তান্ত্রিক আদিনাথের জীবন এবং সাধনা। নামটা আমার পছন্দ। লেখকের নাম হরনাথ শাস্ত্রী। প্রায় নব্বই বছর আগে লেখা এবং ছাপা বই। আদিনাথ ছিলেন হরনাথের জ্যাঠামশাই।"

বললাম, "ওই তান্ত্রিক ভদ্রলোক ১০৮টা নরবলি দিয়েছিলেন?"

"তা-ই তো লিখেছেন হরনাথ। তান্ত্রিক ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল, ওই ১০৮টি প্রেতাত্মা তাঁর চেলা হবে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। একদিন ভোরবেলা

স্বয়ং তান্ত্রিককেই মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। মুণ্ডহীন ধড়। রক্তে-রক্তে ছয়লাপ! নিজেই বলি হয়ে গেলেন।"

হালদারমশাইয়ের গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। বললেন, "মুণ্ড গেল কই?"

কর্নেল হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, "মুণ্ডু পাওয়া যায়নি। অগত্যা ধড়টা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হরনাথ লিখেছেন, দেড় মন ঘি আর আট মন কাঠের আগুনেও তান্ত্রিকের ধড় একটুও পোড়েনি। শেষে লোক-জানাজানি এবং পুলিশের ভয়ে মুণ্ডুকাটা ধড়ে পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, পরদিন ধড়টা জলে ভেসে ওঠে। নদীতে স্রোত ছিল। অথচ ধড়টা দিব্যি স্থির ভাসছে।

বললাম, "হরনাথবাবু দেখেছিলেন এসব ঘটনা?"

"তখন ওঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। কাজেই স্মৃতি থেকে লেখা। কিন্তু তারপর উনি যা লিখেছেন, তা আরও অদ্ভুত। বছর কুড়ি পরে হরনাথবাবু নাকি স্বপ্নে তান্ত্রিক জ্যাঠামশাইকে দেখতে পান। তান্ত্রিক ভদ্রলোক ভাইপোকে বলেন, 'কেউ যদি আমার মুণ্ডুটা ধড়ের সঙ্গে জোড়া দেয়, আমি আবার সশরীরে ফিরে আসব।'"

"ততদিনে দুটোই তো কঙ্কাল। নিছক হাড় আর খুলি।"

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন, "হঃ! স্কেলিটন অ্যান্ড স্কাল!"

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "কিন্তু খুলি কোথায় পোঁতা আছে হরনাথ জানতেন না। কেউই জানত না। উনি কবন্ধ মড়াটা এনে সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর খুলির খোঁজে হন্যে হচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার একদিন আদিনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে একটা মজার ধাঁধা বললেন। ওতেই নাকি খুলির সূত্র লুকনো আছে।

"আটঘাট বাঁধা
বার পনেরো চাঁদা
বুড়ো শিবের শূলে
আমার মাথা ছুঁলে
ওঁ হ্রীং ক্লীং ফট্
কে ছাড়াবে জট॥"

অবাক হয়ে বললাম, "আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখছি!"

কর্নেল হাসলেন। "সহজে মুখস্থ হবে বলেই তো আগের দিনের লোকেরা ছড়া বাঁধত। মাস্টারমশাইরা অনেক ফরমুলা ছড়ার আকারে ছাত্রদের শেখাতেন।"

হালদারমশাই উৎসাহে মাথা নেড়ে বললেন, "হঃ। একখান শিখছিলাম ঃ

"ইফ যদি ইজ হয়
বাট কিন্তু নট নয়···

গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওঁকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তা এই উদ্ভট বই নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী কর্নেল ?"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে দাড়ির ছাই ঝাড়লেন। তারপর অভ্যাসমতো চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "হরনাথ এই ধাঁধার জট ছাড়াতে পারেন নি। ওঁর বংশধররাও পারেননি। কিন্তু সম্প্রতি যা সব ঘটছে বা ঘটেছে, তা থেকে এলাকার লোকদের বিশ্বাস জন্মেছে, তান্ত্রিক আদিনাথের সশরীরে পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমত, সিন্দুকের কঙ্কালটি কে বা কারা চুরি করেছে। দ্বিতীয়ত, দেবী চণ্ডিকার পোড়ো মন্দিরের সামনে পর-পর দুটো নরবলি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, রামু ধোপা সন্ধ্যার মুখে ঝিল থেকে কাপড়ের বোঁচকা গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সবে চাঁদের আলো ফুটেছে, একটা কঙ্কাল ওর সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'আমি সেই আদিনাথ।' রামু গোঁ গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "তারপর ? তারপর ?"

"রামু এখন পাগল হয়ে গেছে। কীসব অদ্ভুত কথাবার্তা বলছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে ওর আচরণ কিছুক্ষণ সুস্থ মানুষের মতো।" কর্নেল বইটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললেন, "গাধাটাও পাগল হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরা দেয় না।"

হালদার মশাই বললেন, "বাট হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস কর্নেলসার ?"

"কঙ্কগড়। আপনি কি যেতে চান সেখানে ?"

"নাহ্। এমনি জিগাই।" গোয়েন্দা ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে হাসলেন। "কিন্তু কঙ্কগড় নামটা চেনা চেনা লাগছে। কঙ্কগড়···কঙ্কগড়···"

কর্নেল বললেন, "কঙ্কগড় বর্ধমান-বিহার সীমান্তে। দুর্গাপুর থেকেও যাওয়া যায়।"

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে একটিপ নস্যি নিলেন। "ছড়াটা কী কইলেন য্যান কর্নেলসার ?"

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটুকরো কাগজে ছড়াটা লিখে ওঁকে দিলেন। মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। হালদারমশাই ছড়াটা মুখস্থ করার চেষ্টায় ছিলেন। আমাদের চোখে-চোখে কৌতুক লক্ষ্য করলেন না।

ষষ্ঠীচরণ আর এক প্রস্ত কফি আনল। কফির পেয়ালা তুলে বললাম, "হালদারমশাই! বোঝা যাচ্ছে এই রহস্যের কেস কর্নেল নিজের হাতে নিয়েছেন। আপনি বরং ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারেন।"

হালদারমশাই বাড়তি দুধমেশানো ওঁর স্পেশাল কফিতে চুমুক দিয়ে খি-খি

করে হেসে উঠলেন। ওঁর এই হাসিটি একেবারে শিশুসুলভ। কে বলবে উনি একসময় দুঁদে পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং ওঁর দাপটে যত দাগি অপরাধী তটস্থ হয়ে থাকত? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে প্রায় ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। মাঝে-মাঝে কর্নেলের কাছে আড্ডা দিতে, আবার কখনও কোনও কেস পেলে ওঁর ভাষায় 'কর্নেলসারের লগে কনসাল্ট করতেও আসেন।

বললাম, "হাসছেন কেন হালদারমশাই?"

হালদারমশাই আরও হেসে বললেন, "কর্নেলসার কইলেন গাধাটা পাগল হইয়া গেছে। গাধা···খি খি খি···গাধা ইজ গাধা। অ্যাস! দুইখান এস্।"

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "সম্ভবত দুইখান এস এলেন। নাহ্। অ্যাস নয়। শশিনাথ শাস্ত্রী।"

বললাম, "নাম শুনে মনে হচ্ছে যজমেনে বামুন। পাণ্ডাপুরুতঠাকুর সম্ভবত। নাকি সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই?"

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার বয়সী একজন যুবক। স্মার্ট, ঝকঝকে চেহারা। পরনে জিনস্, ব্যাগি শার্ট, কাঁধে ঝোলানো কিট্ব্যাগ। কর্নেলকেও একটু অবাক দেখাচ্ছিল। বললেন, "এসো দিপু! তোমার বাবা এলেন না যে?"

যুবকটি বসে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, "মর্নিংয়ে হঠাৎ ট্রাঙ্ককল এল। একটা মিসহ্যাপ হয়েছে বাড়িতে। বাবা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে চলে গেলেন। ন'টা পাঁচে একটা ট্রেন আছে।"

"কী মিসহ্যাপ?"

"আবার কী? একটা ডেডবডি। ভজুয়া নামে আমাদের একজন কাজের লোক ছিল। মন্দিরের সামনে তার বডি পাওয়া গেছে আজ ভোরে। একই অবস্থায়।"

হালদারমশাই নড়ে বসেছিলেন। ফ্যাঁসফেসে গলায় বললেন, "নরবলি?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, "তোমার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই দিপু। হালদারমশাই! এর নাম দীপক ভট্টাচার্য। হরনাথবাবুর কথা আপনাদের বলেছি। তাঁর পৌত্র। দিপু, ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আর—জয়ন্ত চৌধুরী। 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার রিপোর্টার।"

দীপক আমাদের নমস্কার করল। তারপর হালদারমশাইকে বলল, "আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

হালদারমশাই খুশিমুখে বললেন, "ইয়েস।"

কর্নেল বললেন, "দিপু। বরং এক কাজ করো। তুমি হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি যথাসময়ে পৌঁছব।"

দীপক বলল, "দুপুরে সাড়ে বারোটায় একটা ট্রেন আছে। বাবা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"চিন্তার কিছু নেই। আমি যাব'খন। আর শোনো, আমার থাকার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে না।"

"সে কী! বাবা আমাকে—"

"নাহ্। আমি সরাসরি তোমাদের ওখানে উঠলে আমার কাজের অসুবিধে হবে। তুমি বরং হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে উনি যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এটা যেন কাউকে বোলো না।"

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, "আমারে মামা কইবেন।"

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "দিপুরা রাঢ়ের ঘটি। ওর মামা পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বললে লোকের সন্দেহ হবে। আপনি তো দিব্যি স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলতে পারেন।"

"তা পারি।" বলে হালদারমশাই আর একটিপ নস্যি নিলেন।

বললাম, "আসলে উত্তেজনার সময় হালদারমশাইয়ের মাতৃভাষা এসে যায়।"

কর্নেল বললেন, "তা যা-ই বলো জয়ন্ত, পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ওজন আছে। উত্তেজনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা একেবারে অচল। তাই দ্যাখো না, উত্তেজনার সময় যাঁরা পূর্ববঙ্গীয় ভাষা জানেন না, তাঁরা হিন্দি বা ইংরেজি বলেন।"

হালদারমশাই সটান উঠে দাঁড়ালেন। "ইউ আর হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট কর্নেলসার!" বলে পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দীপককে দিলেন। "আমি হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারির সামনে ওয়েট করব। চিন্তা করবেন না।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পা বাড়িয়েছেন, কর্নেল বললেন, "একটা কথা হালদার-মশাই। আপনার একটা ছদ্মনাম দরকার।"

"হঃ।" বলে হালদারমশাই সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

ষষ্ঠীচরণ দীপকের জন্য কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, "ভজুয়ার বয়স কত? কতদিন তোমাদের বাড়িতে ছিল সে?"

দীপক বলল, "বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ওরা পুরুষানুক্রমে আমাদের ফ্যামিলিতে ছিল। জমিদার ফ্যামিলিতে যেমন হয়। একগাদা লোকজন থাকে। অবশ্য এখন আর নেই। ভজুয়া কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী লোক ছিল। ভূতপ্রেতের গল্প বলত বটে, বিশ্বাস করত বলে মনে হয় না। আমার ছেলেবেলায় ওর বউ মারা যায়। কিন্তু ও আর বিয়ে করেনি। আমার অবাক লাগছে, ওর মতো সাহসী আর বলবান লোককে কী করে বলি দিতে পারল?"

"তুমি কি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করো?"

"নাহ। ওসব স্রেফ গুলতাপ্পি। ঠাকুরদা কী সব বোগাস গপ্প ফেঁদে গেছেন, আমি একটুও বিশ্বাস করি না। বাবাও বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু হঠাৎ দু-দুটো নরবলির ঘটনা। তারপর পাতালঘর থেকে সিন্দুকের তালা

ভেঙে কে কঙ্কাল সরাল। তাই বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কর্নেল! পাতালঘরের কথা আমি ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু সিন্দুকে যে কঙ্কাল আছে, তা আমি জানতাম না। নরবলির ঘটনার পর একরাত্রে বাবা আমাকে আর ভজুয়াকে ডেকে চুপিচুপি পাতালঘরে ঢুকলেন। পাতাল-ঘরের দরজার তালা কিন্তু ভাঙা ছিল না। গতকাল সন্ধ্যায় বাবা আপনার কাছে সব কথা খুলে বলেননি।"

"হয়তো কঙ্কগড়ে গেলে বলবেন ভেবেছিলেন।

দীপক চাপা গলায় বলল, "সিন্দুকের ভিতর কঙ্কাল সত্যিই ছিল কি? আমার বিশ্বাস হয় না। অতকালের পুরনো কঙ্কাল। আস্ত থাকার কথা নয়। অথচ সিন্দুকে একটুকরো হাড়ও পড়ে নেই।"

"ভজুয়াকে কেউ ওভাবে খুন করবে কেন? তোমার কী ধারণা?"

দীপক একটু চুপ করে থাকার পর বলল, "সম্ভবত ভজুয়া কিছু জানত। তার মানে, শচীনদা আর জগাইকে কে বা কারা ওভাবে খুন করেছে, সে জানতে পেরেছিল। কারণ জগাই খুন হওয়ার পর ভজুয়া আমাকে বলেছিল, খামোকা একজন সাধুসন্ন্যাসী মানুষের বদনাম রটাচ্ছে লোকে। তাঁর আত্মা স্বর্গে বাস করছেন ভগবানের কাছে। ভজুয়া বলেছিল, শিগগির সে এর বিহিত করবে।"

"ভজুয়া বলেছিল?"

"হ্যাঁ। দাদুর জ্যাঠামশাই সম্পর্কে ভজুয়ার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তার ঠাকুরদার বাবা নাকি ওঁর সেবা করত।" দীপক হঠাৎ একটু নড়ে বসল। "মনে পড়ে গেল! গত মাসে দোতলা থেকে অনেক রাতে আমি ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর আলো দেখেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমি তো আসানসোলে পড়াশোনা করেছি। কঙ্কগড়ে সবসময় থাকিনি। তো সকালে মাকে কথাটা বললাম। মা বললেন, ওই জঙ্গলে আলো নতুন কিছু নয়। মা-ও নাকি অনেকবার দেখেছেন। আমি কিন্তু এতকাল পরে ওই একবার।"

বললাম, "কিসের আলো? মানে—টর্চ না হারিকেন?"

"না। মশালের আলো বলে মনে হয়েছিল।"

কর্নেল চোখে হেসে বললেন, "প্রেতাত্মারা টর্চ বা হারিকেন জ্বালে না জয়ন্ত!"

দীপক বলল, "আপনি কি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন?"

"প্রকৃতিতে রহস্যের শেষ নেই দীপু!"

দীপক যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল! বলল, "আমি চলি তা হলে।"

"আচ্ছা, এসো।"

দীপক বেরিয়ে গেলে বললাম, "কঙ্কগড়ের সাংঘাতিক ভূতটা আপনাকে

পেয়ে বসেছে মনে হচ্ছে। ভুত বা প্রেতাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির কী সম্পর্ক ?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "আছে। প্রকৃতি চির-আদিম। ভুতপ্রেতও আদিম শক্তি, ডার্লিং !"

॥ ২ ॥

কঙ্কগড়ে আমরা উঠেছিলাম সরকারি ডাকবাংলোয়। বাংলোটি পুরনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি। গড়নে বিলিতি ধাঁচ। কিন্তু অযত্নের ছাপ আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। লনের ফুলবাগান আর চারপাশের দেশি-বিদেশি গাছপালা একেবারে জঙ্গুলে হয়ে গেছে। চৌকিদার রঘুলাল দুঃখ করে বলছিল, নতুন সার্কিট হাউস হওয়ার পর সরকারি কর্তারা এলে সেখানেই ওঠেন। সেখানে জায়গা না পেলে তবে কদাচিৎ কেউ এখানে জোটেন। আসলে বসতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই এই দুরবস্থা।

তবে নীচেই সেই বিশাল ঝিল এবং পাশেই জঙ্গলের শুরু। তার ওধারে একটা নদী আছে। তার মানে, একসময় ঝিলটি নদীর অববাহিকার একটা স্বাভাবিক জলা ছিল। ইদানীং অনেকে একে 'লেক' বলতে শুরু করেছে। খনি অঞ্চলের শিল্পনগরী থেকে দল বেঁধে অনেকে পিকনিক করতেও আসে। রঘুলাল বলছিল, নরবলির পর পিকনিক বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অনেক আগে এদিকটা জনহীন হয়ে পড়ে। রঘুলালও সূর্যাস্তের আগে বাড়ি চলে যায়। তবে 'কর্নেলসার' যখন এসেছেন, তখন রাত্তিরটা এখানে কাটাতে তার ভয় নেই। এই সায়েবকে সে ভালই চেনে। এর আগে কতবার উনি এখানে এসেছেন।

আমরা পৌঁছেছিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। বাংলোর বারান্দা থেকে লক্ষ করছিলাম, উনি বাইনোকুলারে পাখি-টাখি দেখতে-দেখতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলেন। রঘুলাল একটা থামে হেলান দিয়ে বসে কঙ্কগড়ের গল্প করছিল। তান্ত্রিক আদিনাথের অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথাও বলছিল। আদিনাথের কঙ্কালের ধড় ও মুণ্ডের কাহিনীও তার জানা। ধড় ও মুণ্ড জোড়া লাগলে তান্ত্রিক আদিনাথ যে সশরীরে আবার আবির্ভূত হবেন, এটা সে বিশ্বাসও করে এবং তার ধারণা, এই কাজটা কেউ করতে পেরেছে এতদিনে। তাই তান্ত্রিকবাবা নিজের কাজে নেমে পড়েছেন।

বললাম, "কিন্তু তান্ত্রিকবাবা তো শুনেছি ১০৮টা নরবলি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আবার কেন উনি নরবলি দিচ্ছেন ?"

রঘুলাল বাংলা বলতে পারে বাঙালির মতোই। মাথা নেড়ে বলল, "না সার ! ১০৮টা নরবলির আগে উনি নিজেই বলি হয়েছিলেন। শুনেছি,

তিনটে নরবলি বাকি ছিল। এতদিনে হয়ে গেল।"

"এই লোক তিনটিকে তুমি চিনতে?"

"চিনব না কেন সার? প্রথমে বলি হলেন শচীনবাবু। উনি ম্যাজিক দেখাতেন।"

"ম্যাজিশিয়ান ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন। তো তারপর গেল জগাই। জগাই শ্মশানে মড়া পোড়াত। শেষে গেল ভজুয়া। জমিদারবাড়ির কাজের লোক। জমিদারি আমাদের ছোটবেলায় উঠে গেছে। তা হলেও জমিদারবাড়ি নামটা টিকে আছে। খুব বড় বাড়ি সার! অনেক ভেঙেচুরে খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। তবে দেখলে বোঝা যায় কী অবস্থা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝুন, তান্ত্রিকবাবা ছিলেন ওই জমিদারবাড়ির লোক। শুনেছি, বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে জপতপ নিয়েই পড়ে থাকতেন।"

এরপর রঘুলাল রামু ধোপা আর তার গাধার গল্পে চলে এল। একঘেয়ে উদ্ভট গল্প শোনার চেয়ে ঝিলের ধারে কিছুক্ষণ বেড়ানো ভাল। লনে নামলে রঘুলাল চাপা গলায় সাবধান করে দিল, "আঁধার হওয়ার আগেই চলে আসবেন সার! কর্নেলসারের কথা আলাদা। উনি মিলিটারির লোক।"

গেট পেরিয়ে ধাপবন্দি পাথরের সিঁড়ি। ফাটলে ঝোপ আর আগাছা গজিয়ে আছে। নীচের রাস্তা এবড়োখেবড়ো। রাস্তাটা এসেছে বাঁ দিক থেকে এবং এখানেই তার শেষ। ডান দিকে ছোট-বড় নানা গড়নের পাথর এবং ঝোপঝাড়, গাছপালা। সামনে একফালি পায়েচলা পথ নেমে গেছে ঝিলের ধারে। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ঘাট। ঝিলের জলটা স্বচ্ছ। সূর্য পেছনে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে। তাই ঝিলে ছায়া পড়েছে। সামনে-দূরে ধূসর কুয়াশা। একটা পানকৌড়ি আপনমনে ডুবসাঁতার খেলছে। একটু দূরে থামের আড়ালে কোথাও জলপিপির ডাক শোনা গেল পি-পি-পি!

ঘাটের মাথায় বসে ছিলাম। কর্নেলের সংসর্গে মাথার ভেতর হয়তো প্রকৃতিপ্রেম ঢুকে গেছে। দিনশেষের এই ধূসর সময়টা সত্যি অনুভব করার মতো। জলমাকড়সার অবিশ্বাস্য গতিতে ছোটাছুটি, জলজ ফুলের ওপর টুকটুকে প্রজাপতি ও গাঙফড়িংয়ের ওড়াউড়ি, পাখপাখালির ডাক। সব মিলিয়ে জীবজগতের একটা আশ্চর্য স্পন্দন।

হঠাৎ পাশেই খুট করে একটা শব্দ। চমকে উঠে দেখি, এক টুকরো ঢিল সদ্য গড়িয়ে পড়ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তন্নতন্ন খুঁজলাম। কাউকেও দেখতে পেলাম না। ঢিলটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। গাডার দিয়ে ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বাঁধা আছে। কাঁপা-

কাঁপা হাতে কুড়িয়ে নিলাম। কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখি ডটপেনের লাল কালিতে লেখা আছে।

ওঁ

ওহে টিকটিকির চেলা! কাল সকালেই কঙ্কগড় ছেড়ে না গেলে মা
চণ্ডীকার পায়ে বলি হয়ে যাবে! বুড়ো টিকটিকিকে জানিয়ে দিয়ো!
আজ রাতে প্রেতাত্মা পাঠিয়ে আগাম সঙ্কেত দেব। সাবধান!

হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, খুদে হরফ। খুব ব্যস্তভাবে লেখা। চিরকুটটা পকেটে ভরে আবার কিছুক্ষণ চারপাশে খুঁটিয়ে দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। ঝিলের পশ্চিম পাড় এটা। উত্তর-পূর্ব কোণে কঙ্কগড় বসতি এলাকা শুরু। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এদিকে ওদিকে নজর রেখে বাংলোর নীচে পেঁছিলাম। গা ছমছম করছিল অজানা ত্রাসে। লোকটা কি আড়াল থেকে নজর রেখেছে? আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রিভলভার পকেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বাংলোয় উঠে গেলাম। রঘুলাল আমাকে দেখে সুইচ টিপে বাতিগুলো জেলে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "আপনি কি কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন সার?"

রুক্ষ মেজাজে বললাম, "নাহ্। কেন?"

রঘুলাল বিনীতস্বরে বলল, "আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।"

"কিছুই দেখাচ্ছে না। তুমি শিগগির এক কাপ চা করো।"

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। সহাস্যে বললেন, "রামুর গাধাটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডার্লিং! গাধাটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। ওকে বুঝিয়ে বললাম, দ্যাখো বাপু, এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়! গাধাবলির বিধান শাস্ত্রে আছে বলে শুনিনি। তবে বলা যায় না।"

আস্তে বললাম, "ব্যাপারটা রসিকতা করার মতো নয়। রীতিমত বিপজ্জনক। এই দেখুন।"

কর্নেল চিঠিটা পড়ে নিয়ে বললেন, "কোথায় পেলে?"

ঘটনাটা বললাম। শোনার পর কর্নেল একটু ব্যাজার মুখে বললেন, "লোকটা আমাকে টিকটিকি বলেছে, এটাই আমার সঙ্কে যথেষ্ট অপমানজনক। তুমি তো জানো জয়ন্ত, টিকটিকি কথাটা এসেছে ডিটেকটিভ থেকে। আমি লোকদের বোঝাতে পারি না, আমি ডিটেকটিভ নই এবং কথাটা আদতে গালাগাল।"

"আজ রাতে ভূত পাঠাবে বলে শাসিয়েছেও।"

"তা একটা কেন, একশোটা পাঠাক। কিন্তু টিকটিকি···ছি!" বলে কর্নেল হাঁকলেন, "রঘুলাল!"

রঘুলাল কিচেন থেকে ট্রেতে কফির পট, পেয়ালা সাজিয়ে এনে টেবিলে

রাখল। সেলাম দিয়ে বলল, "কর্নেলসাবকে আসতে দেখেই আমি কফি বানাতে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন, "খবর পেয়েছি, আজ রাতে এ-বাংলোয় ভূত এসে হানা দেবে। তৈরি থেকো রঘুলাল।"

রঘুলাল কাঁচুমাচু হাসল। "কর্নেলসাব থাকতে ভূতপেরেত ডাকবাংলোর কাছ ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কিন্তু সার, একটু আগে আমার মেয়ে দুলারি এসেছিল। বলল, ওর মায়ের খুব জ্বর। আমি ওকে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে বললাম। তো···"

কর্নেল হাত তুলে বললেন, "না, না! তুমি বাড়ি চলে যেয়ো। রাতের খাবারটা বরং এখনই তৈরি করে রাখো। আমরা খেয়ে নেবখ'ন।"

রঘুলাল হন্তদন্ত কিচেনের দিকে চলে গেল। বললাম, "রঘুলাল আসলে কেটে পড়তে চাইছে। ওর মেয়ের এসে মায়ের জ্বরের খবর দেওয়াটা স্রেফ মিথ্যা।"

"কেন বলো তো?"

"ওর মেয়ে এলে টের পেতাম।"

"তুমি কিছুই টের পাও না, জয়ন্ত!" কর্নেল হাসলেন। তারপর টেবিলে রাখা বাইনোকুলারটি দেখিয়ে বললেন, "এই যন্ত্রচোখ দিয়ে ফ্রকপরা একটি বাচ্চা মেয়েকে বাংলোর লনে আমি দেখেছি। অবশ্য তোমাকে দেখতে পাইনি। কারণ বাংলোটা উঁচুতে। তুমি নীচে ঝিলের ধারে ছিলে। ওখানে যথেষ্ট ঝোপঝাড়। তবে তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তান্ত্রিক হরনাথের প্রেতাত্মা ধারালো খাঁড়া হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কর্নেল কফি শেষ করে ঘরে ঢুকলেন। সত্যি বলতে কি, একা বারান্দায় বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল টেবিলবাতির আলোয় একগোছা অর্কিড খুঁটিয়ে দেখছেন। বোঝা গেল, জঙ্গলে কোথাও সংগ্রহ করেছেন। আমাকে সেই অর্কিডটার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে শুরু করলে বললাম, "ওসব পরে শুনব। রঘুলালের কাছে কিছু তথ্য জোগাড় করেছি। অর্কিডের চেয়ে সেগুলো দামি।"

"কী তথ্য?"

"শচীনবাবু ছিলেন ম্যাজিশিয়ান। আর জগাই ছিল শ্মশানের··· ।"

"হুঁ, ম্যাজিশিয়ানদের বলা হয় জাদুকর। জাদুর সঙ্গে নাকি তন্ত্রমন্ত্রের সম্পর্ক আছে। আবার তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিকের সঙ্গে শ্মশানের সম্পর্ক আছে। কাজেই তোমার তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শাস্ত্রীমশাই, মানে দিপুর বাবার কাছে সে-খবর কলকাতায় বসেই পেয়ে গেছি।"

চাপা গলায় বললাম, "যা-ই বলুন, এই রঘুলাল লোকটিকে আমার পছন্দ

হচ্ছে না। খুব ধূর্ত! আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া ঝিলের ঘাট থেকে বাংলোয় ফেরার সময় কী করে ও টের পেল আমি সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছি? বলল, আপনি কি ভয় পেয়েছেন? আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে··· ।"

"তোমাকে এখনও কেমন যেন দেখাচ্ছে, ডার্লিং!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন। "ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না যারা, ভূতপ্রেতের ভয় তাদেরই বেশি। বিশেষ করে ভূতের চিঠি ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক।"

চটে গিয়ে বললাম, "ভূতপ্রেত হুমকি দিয়ে চিঠিটা লেখেনি। লিখেছে কোনও মানুষ।"

"হুঁ, মানুষ। সেই মানুষকে সম্ভবত তান্ত্রিক আদিনাথের ভূত ভর করেছে।"

রসিকতা শোনার মেজাজ ছিল না। তবে বরাবর এটা লক্ষ্য করেছি, রহস্য যত জটিল এবং সাংঘাতিক হয়, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে রসিকতা তত বেশি ভূতের মতো ভয় করে। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিলাম। ট্রেন আর বাসজার্নির ধকল এতক্ষণে পেয়ে বসেছিল। একটু পরে লক্ষ করলাম, কর্নেল পকেট থেকে একটুকরো ভাঙা চাকতির মতো কী একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন। তারপর কিটব্যাগ থেকে খুদে একটা ব্রাশ আর লোশনের শিশিও বেরোতে দেখলাম। চাকতিটার আধখানা চাঁদের মতো গড়ন। লোশনে ব্রাশ চুবিয়ে ঘষতে থাকলেন কর্নেল! জিজ্ঞেস করলাম, "জঙ্গলে মোহর কুড়িয়ে পেয়েছেন বুঝি?"

কর্নেল আনমনে বললেন, "মোহরের ভাঙা টুকরো বলতেও পারো! তবে সোনার নয়। সেকেলে মুদ্রাও নয়। কী সব খোদাইকরা সিলের টুকরো। কাদা ধুয়ে ফেলেও কিছু বুঝতে পারিনি। দেখা যাক।"

কিছুক্ষণ পরে রঘুলালের সাড়া পাওয়া গেল। ওর হাতে টর্চ আর লাঠি দেখলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "সব রেডি রইল সার! কিচেনঘরের চাবিটা দিয়ে যাচ্ছি। আমি ভোর ছ'টায় এসে যাব।"

কর্নেলের ইশারায় ওর হাত থেকে কিচেনের চাবি নিয়ে এলাম। ও চলে গেল। কর্নেল ভাঙা সিলটা আতশ কাচে দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "গুপ্তযুগের সিল নাকি?"

"কী? গুপ্তযুগ?" কর্নেল নিঝুম সন্ধ্যারাতের পুরনো ডাকবাংলোর স্তব্ধতা ভাঙচুর করে অট্টহাসি হাসলেন। "হুঁ, ওই এক পুরাতাত্ত্বিক বাতিক জয়ন্ত! মাটির তলায় কিছু পাওয়া গেলেই সটান গুপ্তযুগ। তার আগে বা পরে নয়! তবে এটাই আশ্চর্য! এটা পুরো একটা সিলের আধখানা মাত্র। সিলটা আধখানা কেন, এটাই প্রশ্ন।"

এই সময় আচমকা বাংলোর আলো নিভে গেল। কর্নেল তখনই টর্চ জেৰলে বললেন, "ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে হ্যারিকেনটা এনে জেৰলে দাও জয়ন্ত! লোডশেডিং প্রেতাত্মাকে বাংলোয় আসার সুযোগ করে দিতে পারে। কুইক!" তাঁর কণ্ঠস্বরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক। কিন্তু আমার গা ছমছম করতে লাগল।

ইংরেজ আমলের বাংলো। কাজেই ফায়ারপ্লেস আছে। ঝটপট হ্যারিকেন জেৰলে এনে টেবিলে রাখলাম। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। কর্নেল বললেন, "চলো! বরং বারান্দায় বসে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতিদর্শন করা যাক।"

বেরিয়ে গিয়ে দেখি সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। ঝিলের জল ঝিলমিল করছে। গাছপালা তোলপাড় করে বাতাস বইছে। সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি আবার ফিরে এল। ভয়ের চোখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলাম। হাতে টর্চ এবং পকেটে রিভলবার তৈরি। আস্তে বললাম, "সত্যি লোডশেডিং, নাকি কেউ মেইন সুইচ অফ করেছে দেখে আসা উচিত। কারণ ওই তো দূরে আলো দেখা যাচ্ছে।"

কর্নেল বললেন, "ছেড়ে দাও! জ্যোৎস্নায় পুরনো পৃথিবীকে ফিরে পাওয়া যায়। তাছাড়া জ্যোৎস্নার একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে। কোন কবি যেন লিখেছিলেন, "এমন চাঁদের আলো / মরি যদি সে-ও ভাল / সে মরণ স্বরগ-সমান।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "মৃত্যুটা প্রেতাত্মার হাতে হওয়া বড্ড অপমানজনক। আমরা মানুষ।"

"ডার্লিং! তা হলে দেখছি এই আদিম পরিবেশ তোমাকে প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী করতে পেরেছে।"

"বোগাস! আসলে আমি বলতে চাইছি…"

"বলার আগে দেখে নাও। ওই দ্যাখো, ডান দিকে ঝোপের আড়ালে প্রেতাত্মা উঁকি দিচ্ছে!"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেইদিকে টর্চের আলো ফেললাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বোধবুদ্ধি হারিয়ে গেল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালের মাথায় উঁচু ঝোপজঙ্গল। একখানে ঝোপ থেকে মুখ বের করে আছে সত্যিই একটা কঙ্কাল। খুলি থেকে কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ টেবিলে রেখে রিভলবার বের করে ছুঁড়লাম। কর্নেল আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন। "জয়ন্ত! জয়ন্ত! করছ কী?"

এবার টর্চ জেৰলে দেখি কঙ্কাল অদৃশ্য। উত্তেজিতভাবে বললাম, "অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, "সব ভেস্তে দিলে তুমি! আমাদের কাছে ফায়ার আর্মস আছে জেনে গেল প্রেতাত্মাটা। এবার ও খুব সাবধান

হয়ে যাবে।"

বলে কর্নেল টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ চারদিকে আলো ফেলে তন্নতন্ন খুঁজে ফিরে এলেন। একটু হেসে বললেন, "যা ভেবেছি তা-ই। একটা কথা বলি, ডার্লিং! এখানে কোথাও যা কিছু ঘটুক, কখনও মাথা খারাপ করে ফেলবে না। বিশেষ করে গুলি ছোঁড়াটা চলবে না।"

চটে গিয়ে বললাম, "বলি দিলেও চুপচাপ থাকব?"

"তোমাকে বলি দিয়ে ওর লাভ হবে না।"

"আপনাকে যদি চোখের সামনে বলি দেয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখব?"

কর্নেল বারান্দায় বসে চুরুট জেবলে বললেন, "আমাকে বলি দেওয়ার সাহস ওর হবে না। কারণ আমার মনে হচ্ছে, ও আমাকে ভালই চেনে। কংকগড়ে আমি তো এই প্রথম আসছি না।"

হেঁয়ালি করা কর্নেলের এক বিরক্তিকর অভ্যাস। তাই চুপ করে গেলাম। একটু পরে নীচের দিকে মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল! আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। গেটের নীচের রাস্তায় এসে মোটরসাইকেলটা থামল। তারপর টর্চের আলোয় দীপককে আসতে দেখলাম।

তার হাতেও টর্চ ছিল। বারান্দায় এসে বলল, "আলো নেই কেন কর্নেল? সার্কিট হাউসে আলো দেখে এলাম। ওখানে আলো থাকলে এখানেও থাকার কথা।"

"সম্ভবত প্রেতাত্মা মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে গেছে।" কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন। "দিক না। জ্যোৎস্না আজকাল দুর্লভ হয়ে উঠেছে। যাই হোক, আমরা এখানে উঠেছি কী করে জানলে?"

দীপক হাসল। "কিছুক্ষণ আগে রামু পাগলা—মানে সেই রামু বাবার কাছে গিয়েছিল। বিকেলে ঝিলের জঙ্গলে ওর গাধার খোঁজে গিয়ে নাকি আড়াল থেকে দেখেছে, এক দাড়িওয়ালা সায়েব-ভূত ওর গাধার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখেই সে পালিয়ে এসেছে। আপনি তো শুনেছেন, বাবার কোবরেজি বাতিক আছে। রামুকে রোজ সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক কী সব পাচন গেলাচ্ছেন। রামু লক্ষ্মীছেলের মতো রোজ তিনবেলা বাবার কাছে পাচন গিলতে যায়। তো বাবা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন, আপনি এই ডাকবাংলোয় উঠেছেন কি না। কারণ এই বাংলোটা ঝিল আর জঙ্গলের কাছেই।"

"আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর কী?"

"ওঁকে নিয়ে প্রবলেম। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। গতকালও তা-ই। রাত দুপুরে ফিরেছিলেন। আজ কখন ফেরেন কে জানে?"

"কতদূর এগোলেন, কিছু বলেছেন তোমাকে ?"

"ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের খুলি কোথায় পোঁতা ছিল, সেই জায়গাটা নাকি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আপাতত আমাকে জায়গাটা দেখাতে চান না। যথাসময়ে দেখাবেন। দ্যাটস্ মাচ।" দীপক উঠে দাঁড়াল। "মেইন সুইচটা দেখে আসি। এভাবে বসে থাকার মানে হয় না!"

"থাক দিপু! পরে আলো জ্বালা হবে। তুমি গিয়ে দ্যাখো, হালদারমশাই ফিরলেন কিনা। ওঁর জন্য একটু চিন্তা হচ্ছে। গোয়েন্দা হিসাবে পাকা। পুলিশের প্রাক্তন দারোগা। দুর্দান্ত সাহসী। তবে বড্ড হঠকারী মানুষ। আর শোনো, আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগাযোগ কোরো না। দরকার হলে আমিই করব। বাবাকে বোলো, আমরা খাসা আছি। প্রেতাত্মা-দর্শনেরও সৌভাগ্য হয়েছে।'

দীপক চমকে উঠল, "মাই গুডনেস! প্রেতাত্মা মানে ?"

"ভূত। দিপু, তুমি এখনই কেটে পড়ো।"

দীপক হেসে ফেলল। তারপর, "ঠিক আছে, চলি।" বলে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

কিচেনের পাশে মেইন সুইচ সত্যি নামানো ছিল। আমার সন্দেহ রঘুলালই কাজটা করেছে। কিন্তু কর্নেল তা মানতে রাজি নন। রঘুলাল তাঁর চেনা লোক। অমন বিশ্বাসী লোক নাকি তিনি জীবনে দেখেননি। দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজে বহুবার কংকগড়ে এসেছেন। রঘুলাল তাঁর সেবাযত্নের ত্রুটি করেনি। তাঁর সঙ্গী হয়েও ঘুরেছে।

তবে লোকটি পাকা রাঁধুনি, স্বীকার না করে পারলাম না। খাওয়ার পর বারান্দায় কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে যখন শুয়ে পড়লাম, তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। আমার ঘুম আসছিল না। কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। জানালার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছে। এই বুঝি তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল এসে উঁকি দেবে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চাপা স্বরে বললেন, "উঠে পড়ো ডার্লিং! শিগগির!"

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম "সকাল হয়ে গেল নাকি ?"

"নাহ্। রাত দেড়টা বাজে! এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। ওঠো, ওঠো!"

"কোথায় ?"

"বাইরে গিয়ে দ্যাখো। তা হলেই বুঝতে পারবে।"

দরজা কর্নেলই খুলে রেখেছেন। বাংলোর লনে আলো পড়েছে! তার

ওধারে আদিম প্রকৃতি। ঝিলের দক্ষিণে জঙ্গলের ভেতর একটা আলো চোখে পড়ল। আলোটা নড়াচড়া করছে। বললাম, "দীপক এই আলোর কথাই বলেছিল তা হলে!"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ সেই আলো। ঝটপট রেডি হয়ে নাও। টর্চ, ফায়ার আর্মস সঙ্গে নেবে। কিন্তু সাবধান! আলো জ্বালবে না বা মাথা খারাপ করে গুলি ছুঁড়বে না।"

কর্নেল তৈরী হয়েই ছিলেন। আমি তৈরী হয়ে বেরোলে দরজায় তালা এঁটে দিলেন। তারপর দু'জনে গেট পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে রাস্তায় নামলাম। এবার কর্নেল, আগে, আমি পেছনে। বনবাদাড় ভেঙে কর্নেল হাঁটছেন। আমি ওকে অনুসরণ করে চলেছি। জ্যোৎস্নার জন্য জঙ্গলের ভেতরটা মোটামুটি স্পষ্ট। কোথাও চকরাবকরা, কোথাও ঘন ছায়া। শনশন করে বাতাস বইছে। কর্নেল যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে পারলাম, এই জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি ওঁর পরিচিত। সেই আলোটা কখনো-কখনো আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আলোটা জ্বলছে ঝিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে আমরা যেখানে পেঁছিলাম, সেখানে একটা ধ্বংসস্তূপ। কর্নেল গুঁড়ি মেরে দুটো জঙ্গলে-ঢাকা স্তূপের মাঝখান দিয়ে এগোলেন। ফিসফিস করে বললেন, "চুপচাপ এসো। টুঁ শব্দটি নয়।"

খানিকটা এগিয়ে একটা উঁচু প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় গেলাম দুজনে। প্রকাণ্ড সব ঝুরি নেমেছে বটগাছটার। একটা ঝুরির আড়ালে কর্নেল বসে পড়লেন। আমিও বসলাম। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই একটা মশাল মাটিতে পোঁতা আছে। দাউদাউ জ্বলছে।

আর মশালের পাশে দাঁড়িয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করছে সেই নরকঙ্কালটা। মশালের পেছনে একটা পাথুরে দেওয়াল। দেওয়ালে কঙ্কালটার ছায়াও নড়ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন, এ এমন একটা দৃশ্য।

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, কঙ্কালের দু' হাতের মুঠোয় একটা চকচকে খাঁড়া। একটু তফাতে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। তার পাশে একটা লোক আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কঙ্কালটা খাঁড়া নাচিয়ে খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, "এখনও বলছি ওটা কোথায় আছে বল। না বললেই বলি হয়ে যাবি।

বন্দি লোকটা গোঁ-গোঁ করে কী বলার চেষ্টা করল। পারল না।

কঙ্কালটা হুঙ্কার দিল। "ন্যাকামি হচ্ছে? তুই আমার খুলির সমাধি খুঁড়েছিস। তুই, তুই ওটা পেয়েছিস। দে বলছি!"

বন্দি লোকটা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। তখন কঙ্কালটা এক পা বাড়িয়ে খাঁড়া তুলে তেমনই খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, "তবে মর!"

এর পর আমার মাথার ঠিক রইল না। কর্নেলের নিষেধ ভুলে গেলাম।

চোখের সামনে নরবলি হবে! আস্ত একটা ভূত মানুষের গলায় কোপ বসাবে! এ সহ্য করা যায়? একলাফে বেরিয়ে গিয়ে রিভলবার তুলে গর্জে উঠলাম, "নিকুচি করেছে ব্যাটাচ্ছেলে ভূতের!"

অমনই কঙ্কালটা শূন্যে ভেসে পেছনের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়া করতে যাচ্ছি, কর্নেল ডাকলেন, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! কী পাগলামি করছ?" খাপ্পা হয়ে বললাম, "পাগলামি আমি করছি না আপনি? চোখের সামনে একটা মানুষকে একটা ভূত ব্যাটাচ্ছেলে বলি দেবে···"

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "প্রেতাত্মার পেছনে তাড়া করে লাভ নেই, ডার্লিং! বরং এসো হালদারমশাইয়ের বাঁধন খুলে দিই।"

আকাশ থেকে পড়ে বললাম, "উনি হালদারমশাই? কী সর্বনাশ!"

কর্নেল মশালটা উপড়ে এনে বন্দি হালদারমশাইয়ের কাছে পুঁতলেন। মশালটা তৈরী করা হয়েছে একটা ত্রিশূলে। টর্চের আলোয় গোয়েন্দা ভদ্রলোকের দুর্দশা দেখে কষ্ট হল। দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়ার পর উনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। খি-খি করে একচোট হেসে বললেন, "বলি দিত না। ভয় দ্যাখাইতাছিল।"

কর্নেল টর্চের আলো জেলে সেই ভাঙা দেওয়ালের কাছে কিছু তদন্ত করতে গেলেন। আমি বললাম, "হালদারমশাই! কঙ্কালটার হাতে খাঁড়া ছিল। সে সত্যি আপনার গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছিল।"

"কী? কঙ্কাল? হালদারমশাই পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন। "কই কঙ্কাল? কোথায় কঙ্কাল? কোথায় দেখলেন?"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "নাহ্। একজন সাধুবাবা। কাপালিক কইতে পারেন। তারে ফলো করে আসছিলাম। হঠাৎ সে গাছের উপর থেকে জাম্প দিল। ওঃ! কী সাংঘাতিক জোর তার গায়ে মশাই!"

"কিন্তু আমরা দেখলাম একটা কঙ্কাল খাঁড়া হাতে আপনাকে শাসাচ্ছে।"

"ভুল দ্যাখছেন!" বলে হালদারমশাই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালেন। আবার একচোট হেসে বললেন, "আমার ফায়ার আর্মস আছে টের পাই নাই।"

"তা হলে কোন কঙ্কাল আপনি দেখেননি?"

"নাহ্।"

"কিন্তু সে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। শাসাচ্ছিল।"

"কাপালিক! কাপালিক!"

কর্নেল এসে বললেন, "কঙ্কালটাকে হালদারমশাই দেখতে পাননি। কারণ ওঁকে ওপাশে কাত করে ফেলে রেখেছিল। উনি ভাবছিলেন, যে-কাপালিক ওঁকে ধরেছে, সে-ই কথা বলছে।"

হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "কর্নেল সার! জয়ন্তবাবু কঙ্কালের কথা বলছেন। কিছু বুঝতে পারতাছি না। আপনি বুঝাইয়া দেন, এখানে স্কেলিটন আইল ক্যামনে?"

"পরে বুঝিয়ে দেব। এদিকটায় ঝিলের একটা ঘাট আছে। চলুন ঝিলের জলে, ঘাড়ে আর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেবেন। ব্রেন ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

কর্নেল মশালটা মাটিতে ঘষটে নেভালেন। তারপর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানেও একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ঘাট। হালদারমশাই রগড়ে হাত-মুখ ধুলেন। কাঁধে জলের ঝাপটা দিলেন। তারপর বললেন, "ওই যাঃ! হোয়্যার আর মাই শুজ? অ্যান্ড মাই টর্চ?"

কর্নেল হাসলেন। "দেখলেন তো? জল আপনার ব্রেন কেমন চাঙ্গা করে দিয়েছে।"

হালদারমশাইয়ের জুতো দুটো ওপাশে একটি ভাঙা মন্দিরের তলায় অনেক খোঁজার পর পাওয়া গেল। কিন্তু টর্চটা পাওয়া গেল না। এদিকটায় একসময় দালানকোঠা ছিল বোঝা যাচ্ছে। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, "হ্যাঁ। এখানেই কঙ্কগড়ের রাজধানী ছিল। এখন জঙ্গল। মুঘল আমলের একটা গড়ও ছিল। সেটা এই জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন একটা ঢিবিমাত্র। যাই হোক, আর এখানে নয়। বাংলোয় ফেরা যাক।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "টর্চটা গেল। কাপালিকেরই কাজ!"

কর্নেল বললেন, "কাপালিক আপনার টর্চ কুড়নোর সময় পায়নি। কাল সকালে এসে বরং ভাল করে খুঁজবেন।"

আমরা কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ পেছন থেকে একঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। তারপর দীপকের সাড়া পেলাম। "কর্নেল! আমি দীপু।"

হালদারমশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন, "এসো ভাগনে! এসো, মামা ভাগনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।"

দীপক প্রায় দৌড়ে এল। উত্তেজিতভাবে বলল, "জঙ্গলে আলো দেখতে পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বিকট হাসি শুনলাম। টর্চ জেবলে দেখি..."

কর্নেল বলে উঠলেন, "কঙ্কাল?"

"হ্যাঁ! আস্ত কঙ্কাল।" দীপকের হাতে একটা বল্লম দেখা গেল। সেটা তুলে সে বলল, "বল্লমটা তাক করতেই কঙ্কালটা ভ্যানিশ! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না কর্নেল! তবে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কী করা উচিত ভাবছি, সেই সময় ঝিলের ঘাটে টর্চের আলো চোখে পড়ল। আপনাদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আলোটা দেখেই কি আপনারাও এখানে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল বললেন। "এবং আমরাও কঙ্কালটাকে দেখেছি।"

হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি দেখি নাই। আমি একজন কাপালিক দেখেছি। তারে ফলো করছিলাম।"

দীপক বলল, "কাপালিক! বলেন কী মামাবাবু?"

"হঃ! কাল রাত্রেও তারে ফলো করছিলাম। চণ্ডীর মন্দিরের ওখানে ত্রিশূল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। আমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। আবার আজও বহুক্ষণ ওত পেতে থেকে তারে দেখলাম। আজ আর মাটি খুঁড়ছিল না। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা ছিল।" বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। "বোঁচকাটা গেল কই?" বোঁচকা লইয়া দৌড়ানো সহজ নয়। বোঁচকায় কী থাকতে পারে বলুন তো কর্নেলসাব?"

কর্নেল বললেন, "কঙ্কাল থাকতেও পারে।"

দীপক বলল, "তা হলে ওটা কি ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের সেই কঙ্কাল?"

কর্নেল বললেন, "কিছু বলা যায় না! তবে আর এখানে নয়। বাংলোয় ফেরা যাক। দিপু তুমিও এসো। মামাবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরবে।"

দীপক পা বাড়িয়ে নার্ভাস হেসে বলল, "ঠাকুরদার লেখা বইটার কথা তা হলে সত্যি? কিন্তু কে ওই কাপালিক?"

আমি বললাম, "সে-যে-ই হোক, আপনাদের পাতালঘর থেকে সে কঙ্কাল চুরি করেছে। এবং কোথায় খুলি পোঁতা ছিল তাও আবিষ্কার করেছে। তারপর ধড়ের সঙ্গে মুণ্ড জুড়েছে। প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি বা না করি, এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।"

হালদারমশাই আনমনে বললেন, "আমি কঙ্কাল দেখলাম না ক্যান?"

বললাম, 'চোখে দেখেননি। তার বিদঘুটে কথাবার্তা কানে তো শুনেছেন।"

"হঃ।" বলে গুম হয়ে গেলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

ডাকবাংলোয় আবার আলো নেই। তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের ঘরের দরজার তালা ভাঙা। কিচেনের দিকে গিয়ে দেখি, মেন সুইচ আগের মতো অফ করা আছে। অন করে দিলাম। আলো জ্বলে উঠল। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, লণ্ডভণ্ড অবস্থা। কর্নেল তাঁর কিট্‌ব্যাগ গোছাচ্ছেন। হালদারমশাই বিড়বিড় করছেন, "চোর! চোর! কাপালিক না, চোর!"

দীপক আর আমি ওলটপালট বিছানা দুটো ঠিকঠাক করে ফেললাম। আমার ব্যাগের জিনিসপত্র মেঝেয় ছত্রখান হয়ে পড়ে ছিল। গুছিয়ে নিলাম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "চোর বড্ড বোকা। তার এটুকু বোঝা উচিত ছিল, যা সে খুঁজতে এসেছে, তা বাংলোয় রেখে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আসলে প্রথমে সে ধরেই নিয়েছিল জিনিসটা হালদারমশাইয়ের কাছে আছে। তাই তাঁকে বলিদানের ভয় দেখাচ্ছিল। আমরা গিয়ে পড়ার পর

সে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার মাথায় তখন খটকা বেধেছে। বলিদানের হুমকিতেও যখন জিনিসটা পাওয়া গেল না তখন ওটা নিশ্চয় হালদারমশাইয়ের কাছে নেই। সম্ভবত আমার কাছেই আছে। অতএব আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাংলোয় এসে হানা দিয়েছিল।"

কর্নেল মেঝের দিকে তাকালেন। "খালি পায়ে এসেছিল চোর। লাল সুরকির স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। হুঁ, একটুখানি জলকাদা ভেঙেই—মানে শর্টকাটে এসেছিল সে। যাই হোক, রাত তিনটে বাজে প্রায়। জয়ন্ত, তুমি কিচেনে গিয়ে কেরোসিন কুকার জেবলে, প্লিজ, একপট কফি করে ফেলো! কফি! কফি এখন খুবই দরকার।

দীপক বলল, "চলুন জয়ন্তদা! আমি আপনাকে হেল্প করছি।"

রঘুলাল কাজের লোক। কিচেনে সব কিছু ঠিকঠাক রেখে গিয়েছিল। কফি তৈরির কাজটা আমিই করলাম। দীপক প্রহরীর মতো বল্লম আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল, যে ভীষণ ভয় পেয়েছে। পাওয়ারই কথা। ভয় কি আমিও পাইনি? এই চর্মচক্ষে জ্যান্ত কঙ্কাল দর্শন আর তার বিকট খ্যানখেনে গলায় কথাবার্তা শোনা জীবনে একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। কর্নেল ঠিকই বলেন, 'প্রকৃতির রহস্যের শেষ নেই। সভ্যতার আলোর তলায় আদিম রহস্যে ভরা অন্ধকার থেকে গেছে।'

কফি করতে করতে হালদারমশাইয়ের দুর্দশার বিবরণ দিলাম দীপকবাবুকে। দীপক হাসবার চেষ্টা করে বলল, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে।"

বললাম, "কর্নেলের মাথাতেও কম ছিট নেই।"

ট্রেতে কফির পট আর পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এলাম। দীপক কিচেনে তালা এঁটে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি হালদারমশাই চাপা গলায় কর্নেলকে তাঁর তদন্ত রিপোর্ট দিচ্ছেন।

কফি খেতে-খেতে ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্যান্ট-শার্টে লালচে দাগড়া-দাগড়া ছোপ। খি-খি করে হেসে বললেন, "কর্নেলসার কইলেন, যে দড়ি দিয়া আমারে বাঁধছিল, তা নাকি রামু ধোপার গাধা বাঁধার দড়ি। ঠিক, ঠিক। তাই তো ভাবছিলাম, কাপালিক দড়ি পাইল কই?"

রামু এবং তার গাধাকে নিয়ে কর্নেল হালদারমশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ রসিকতার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "নাহ্‌ দিপু এবার শুয়ে পড়া উচিত। তোমার মামাবাবুর ওপর বড্ড ধকল গেছে। ওঁর বিশ্রাম দরকার।"

"হুঃ।" বলে হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। কর্নেল বললেন, "তা হলে ডার্লিং, তোমাকে যা বলেছিলাম..."

ওঁর কথার ওপর বললাম, "হ্যাঁ। রহস্য ঘনীভূত। কিন্তু কঙ্কাল যে

জিনিসটা চাইছিল, সেটা কি ওই চাকতি ?”

“হ্যাঁ। ব্রোঞ্জের সিল।”

“কী আছে ওতে ?”

কর্নেল সেই ছড়াটা আওড়ালেন ঘুমঘুম কণ্ঠস্বরে ঃ

আটঘাট বাঁধা
বার পনেরো চাঁদা
বুড়ো শিবের শূলে
আমার মাথা ছুঁলে
ওঁ হ্রীং ক্লীং ফট্
কে ছাড়াবে জট ॥

তারপর ওঁর নাক-ডাকা শুরু হল। কয়েকবার ডেকে আর সাড়া পাওয়া গেল না ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এমন সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার পর ঘুমনো যায় না। বারবার সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসছিল। মশালের আলোয় ভাঙা দেওয়ালের ধারে একটা নরকঙ্কাল। দু'হাতে চকচকে খাঁড়া ; তার ওই খ্যানখেনে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। তড়াক করে উঠে বসলাম। কর্নেলকে দেখতে পেলাম। মাথার টুপিতে শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল, খড়কুটো আটকে আছে। হাতে প্রজাপতি ধরা নেট-স্টিক। গলায় ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার ঝুলছে। বললেন, “দশটা বাজে প্রায়। ব্রেকফাস্ট রেডি। রঘুলালকে বলে গিয়েছিলাম, তোমাকে যেন যথেচ্ছ ঘুমোতে দেয়।”

উনি পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলেন। বুঝলাম, যথারীতি ভোরবেলা প্রকৃতিজগতে চলে গিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরি করেই ফিরেছেন আজ।

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্টে বসে বললাম, “কঙ্কালের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যিই কি ওটা তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল ?” কর্নেল দাড়ি থেকে একটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, “কাল রাতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত। কিন্তু তোমার হঠকারিতার জন্যই সব ভেস্তে গেল। তুমি যদি আমার কথা মেনে চুপচাপ থাকতে, আমাকে আর বেশি পরিশ্রম করতে হত না।”

“কী মুশকিল ! ব্যাটাচ্ছেলে হালদারমশাইয়ের গলায় খাঁড়ার কোপ চালাতে যাচ্ছিল যে।” কর্নেল আনমনে বললেন, “যা হওয়ার হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে বেরনো যাক।”

“ওই ভুতুড়ে জঙ্গলে ?”

“নাহ্। শ্মশানে।”

॥ ৪ ॥

কঙ্কাল দর্শনের পর শ্মশানযাত্রা। যদিও দিনদুপুর, ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। কর্নেলের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বনবাদাড় ভেঙে যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা নদী। নামেই নদী। বালি আর পাথরে ঠাসা অগভীর একটা সোঁতা। এঁকেবেঁকে ঝিরঝিরে একফালি কালো জল অবশ্য বয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় জীর্ণ কুঁড়েঘর। নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে তিনটে কাচ্চাবাচ্চা হুল্লোড় করে কী খেলা খেলছে।

কর্নেল কুঁড়েঘরের কাছে গেলেন। এতক্ষণে ওপাশে একটা বাঁশের মাচা দেখতে পেলাম। মাচায় বসে আছে একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। কষ্টিপাথরে খোদাই করা চেহারা যেন। পরনে হাফপ্যাণ্ট আর ছেঁড়া লাল গেঞ্জি। আমাদের দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্নেল মিঠে গলায় বললেন, "কী মনাই? আমাকে চিনতে পারছ না? গত বছর তুমি আমাকে জঙ্গলের গাছ থেকে কত অর্কিড পেড়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ছে।"

মনাই নামে ছেলেটির মুখে একই হাসি ফুটল। মাচা থেকে নেমে সেলাম দিয়ে বলল, "নদীর ওপারে একটা গাছে দেখেছি সার! লাল-লাল পাতা।"

"তোমার বাবার খবর শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে মনাই!"

মনাইয়ের মুখের খুশি চলে গেল। চোখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। বুঝলাম, মনাই সেই জগাইয়ের ছেলে। তার চোখ ছলছল করছিল।

কর্নেল বললেন, "তোমার মা কোথায়?"

মনাই আস্তে বলল, "ঘাটোয়ারিবাবুর অফিসে গেছে। বাবার মাইনের টাকা বাকি আছে। বাবু রোজ ঘোরাচ্ছে মাকে।"

কর্নেল বাঁশের মাচায় সাবধানে বসলেন। পুরনো মাচা ওঁর ভার সইতে পারবে না মনে হচ্ছিল। উনি ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। ভয়ে-ভয়ে একপাশে বসলাম। কর্নেল বললেন, "জগাইয়ের এটা আড্ডা দেওয়ার আখড়া ছিল জয়ন্ত! সন্ধ্যেবেলা ওর কাছে কত লোক আড্ডা দিতে আসত। তাই না মনাই?"

মনাই মাথা নাড়ল।

"মাঝে-মাঝে সাধুসন্ন্যাসীরাও এসে এখানে ধুনি জ্বালিয়ে বসতেন শুনেছি। জগাই বলছিল। তো তোমার বাবা খুন হওয়ার আগেও নিশ্চয় কোনও সাধুসন্ন্যাসী এসেছিলেন। ওই যে! ধুনির ছাই দেখছি।"

মনাই একটু ইতস্তত করে বলল, "ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে এক সাধু আসত সার! চেহারা দেখলে ভয় করে। মাথায় জটা। লাল চোখ। মা বলছিল, ওই সাধুই

প্রথমে ম্যাজিকবাবুকে চণ্ডীর থানে বলি দিয়েছে। তারপর বাবাকে।"

"ম্যাজিকবাবু মানে শচীন হাজরা?"

মনাই মাথা দোলাল। বলল, "মা বলছিল, ওই সাধুই অজ্ঞান করে বাবাকে বলি দিয়েছে। বাবাকে যে-রাত্তিরে বলি দেয়, খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি জেগেই ছিলাম। মা বারবার ঘরের দোর ফাঁক করে বাবাকে ডাকছিল। বাবা এল না। শেষে জলঝড় থামলে মা লণ্ঠন হাতে এখানে এল। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে এল। বলল, দু'জনে ঠ্যাং ধরে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকাব।"

কর্নেল চুরুট জেবলে বললেন, "বলো কী! তারপর?"

"এসে দেখি বাবা নেই। সাধু বসে আছে। মা সাধুবাবাকে ডাকাডাকি করল। সাধুবাবা চোখ বুজে মন্তর পড়ছিল। তাকালই না। তখন মা সাধুবাবাকে বকাঝকা করল। অনেকক্ষণ পরে সাধুবাবা চোখ কটমট করে বলল, "জগাইকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। তোরা ঘুমোগে যা।"

"তোমরা ঘুমোতে গেলে?"

মনাই ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বলল, "হুঁ। তারপর আর বাবার পাত্তা নেই। সকালে একটা মড়া এল। ঘাটোয়ারিবাবুর লোক এক পাঁজা কাঠ মাথায় করে এল। বাবা নেই দেখে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করল। সেই সময় রামু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে খবর দিল চণ্ডীর থানে।"

মনাই ঢোক গিলে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "পুলিশ আসেনি তারপর?"

"এসেছিল সার! মা সব বলেছে পুলিশকে।"

"আচ্ছা মনাই, সেই সাধুবাবাকে আগে কখনও দেখেছ? ভাল করে ভেবে বলো।"

"দেখিনি। তবে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল।"

"ভজুয়াকে নিশ্চয় চিনতে তুমি? সে-ও তো বলি হয়ে গেছে শুনেছি।"

"হ্যাঁ সার! মা বলছিল এ-ও সাধুবাবার কাজ। সাধুবাবা নাকি মানুষ না। মানুষের রূপ ধরে এসেছিল।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন। "ঠিক বলেছ মনাই! শুনেছি সাধুবাবা আসলে একটা নরকঙ্কাল।"

মনাই চমকে উঠল। ভয়-পাওয়া মুখে বলল, "সার! মা বলছিল, সাধুবাবার কাছে যেন একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দেখতে পাইনি। মা নাকি দেখেছিল।"

"সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে?"

মনাই জোরে মাথা দোলাল। কর্নেল ওর হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল। বলল, "চলুন সার! সেই

গাছ থেকে লালপাতার ঝুরি পেড়ে দেব।"

"ওবেলা আসব'খন। তো, ভজুয়া তোমার বাবার কাছে আড্ডা দিতে আসত না?"

"আসত। আসত সার!"

"সাধুবাবা থাকার সময় ভজুয়া এসেছিল?"

"হুঁউ!"

কর্নেল উঠলেন। বললেন, "ওবেলা আসব। তখন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। চলি!"

শ্মশানতলা থেকে একফালি পায়ে-চলা পথে পৌঁছে বললাম, "ছেলেটা বেশ স্মার্ট। এবং অত্যন্ত সরল।"

"প্রকৃতির মধ্যে যারা থাকে, তারা স্বভাবত সরল হয়। আর ওকে স্মার্ট বললে। সে-ও ঠিক। কারণ এখনই ওকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই দিতে হবে। সম্ভবত এই বয়সেই ঘাটোয়ারিবাবু ওকে কাজে বহাল করবেন। তবে মড়াপোড়ানো কাজটা ওর পক্ষে কঠিন হবে না। বাবার সঙ্গে এই কাজটা ওকে করতে হয়েছে। আমি দেখেছি।"

"এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"ম্যাজিকবাবুর বাড়ি।"

কঙ্কগড়ের এদিকটা চেহারায় একেবারে পাড়াগাঁ। গা ঘেঁষাঘেঁষি মাটির বাড়ি, টালি বা খড়ের চাল। কিন্তু কয়েকটা বাড়ির মাথায় টিভি-র অ্যান্টেনা দেখে অবাক হলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা পিচের রাস্তায় উঠলাম। এর পর মফস্বল শহরের চেহারা। নতুন-পুরনো একতলা বা দোতলা বাড়ি। পিচ রাস্তায় ট্রাক, টেম্পো, জিপ, প্রাইভেট কার এবং সাইকেল রিকশার বিরক্তিকর আনাগোনা। মোড়ে একটা খালি সাইকেল রিকশার কাছে গেলেন কর্নেল। বললেন, "ওহে রিকশাওলা, এখানে ম্যাজিকবাবুর বাড়িটা কোথায় জানো?"

রিকশাওলা চমকে-ওঠা ভঙ্গিতে বলল, "ম্যাজিকবাবু? সে তো মা চণ্ডীর থানে নরবলি হয়ে গেছে সার!"

"বলো কী!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড। কথায় বলে, বেদের মরণ সাপের হাতে। যে ভূতটাকে নিয়ে খেলা দেখাত, সেই ভূতটাই নাকি বলি দিয়েছে!"

"ভূত নিয়ে খেলা দেখাত ম্যাজিকবাবু? কেমন ভূত? তুমি দেখেছিলে ভূতের খেলা?"

রিকশাওলা দুঃখিত মুখে একটু হাসল। "দেখেছিলাম সার! নরকঙ্কাল ইস্টেজে এসে নাচত। ম্যাজিকবাবু বলত, ওঠ। উঠে দাঁড়াত। বোস, বললে বসত। নাচ, বললে নাচত। সে কী নাচ সার!"

কর্নেল চুরুট জেবলে বললেন, "ওর বাড়িটা কোথায় ? নিয়ে চলো আমাদের।"

রিকশাওলা বলল, "ম্যাজিকবাবুর নিজের বাড়ি তো ছিল না সার ! বাউণ্ডুলে লোক। মাঝে-মাঝে এসে থাকত। আবার চলে যেত কোথায়।"

"কিন্তু কার বাড়িতে এসে থাকত ?"

"মোহনবাবুর বাড়িতে। ইস্কুলের মাস্টার উনি।"

"চলো। মোহনবাবুর কাছে যাওয়া যাক।" বলে কর্নেল রিকশায় উঠে বসলেন। ওঁর ইশারায় আমিও উঠে বসলাম।

রিকশাওলা বলল, "কিন্তু মাস্টারমশাই তো এখন ইস্কুলে আছেন।"

"ওঁর বাড়ি গিয়ে খবর দেব'খন। তুমি ওঁর বাড়িতেই নিয়ে চলো।"

"বাড়ি অবধি রিকশা যাবে না।"

"যতদূর যায়, নিয়ে চলো।"

রিকশাওলা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে প্যাডেলে চাপ দিল। যেতে-যেতে বলল, "মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাউকে পাবেন না। মিছিমিছি হয়রান হবেন, সার !"

কর্নেল বললেন, "কেন ? বাড়িতে লোক নেই ?"

"নাহ্। মাস্টারমশাই একা থাকেন। বিয়ে-টিয়ে করেননি। বিধবা দিদিকে এনে রেখেছিলেন। তিনিও স্বর্গে গেছেন।"

"ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে নিশ্চয় কোনও সম্পর্ক ছিল মাস্টারমশাইয়ের ?"

"শুনেছি, পিসতুতো না মাসতুতো ভাই ওঁরা !"

পিচরাস্তা ছেড়ে খোয়াঢাকা এবড়ো-খেবড়ো ঘিঞ্জি গলি-রাস্তায় এগোচ্ছিল রিকশা। একসময় নিরিবিলি একটা জায়গায় পৌঁছলাম। কাছাকাছি বাড়ি নেই। শুধু জরাজীর্ণ ছোট-ছোট মন্দির আর পোড়ো ভিটে। জঙ্গল গজিয়ে আছে চারদিকে। সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। একধারে রিকশা দাঁড় করিয়ে রিকশাওলা বলল, "আর যাওয়া যাবে না সার। এই যে পায়েচলা রাস্তা দেখছেন, সিধে গিয়ে বাঁ দিকে তাকাবেন। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি দেখতে পাবেন !"

আমরা নামলে সে রিকশা ঘুরিয়ে একটু হেসে বলল, "মাস্টারমশাইকে খবর দেওয়ার লোক পাবেন কি ? দেখুন। বরঞ্চ আমাকে দুটো টাকা বাড়তি দিলে ইস্কুলে খবর দেব। আপনাদের ফেরত নিয়েও যাব।"

"কর্নেল ওকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "দরকার নেই। আমি লোক খুঁজে নেব।"

রিকশাওলা এতক্ষণে সন্দিগ্ধমুখে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে রিকশার সিটে উঠল। তারপর কে জানে কেন, খুব জোরে রিকশা চালিয়ে চলে গেল। কর্নেল অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, 'এসো জয়ন্ত। কুইক। আমার ধারণা, রিকশাওলা মোহনবাবুকে হেচে পড়েই খবর দেবে, দু'জন উটকো লোক ওঁর বাড়িতে গেছেন।"

পায়েচলা পথে শুকনো পাতা পড়ে আছে। দু'ধারে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা শিবমন্দির। ঘন ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছপালা। পাখিদের তুমুল চ্যাঁচামেচি চলেছে। এলোমেলো জোরালো হাওয়া দিচ্ছে। বাঁ দিকে প্রায় হানাবাড়ির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ি দেখা গেল। সদর দরজায় তালা আঁটা। কর্নেল বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। ওদিকটায় একটা হজামজা পুকুর দেখা গেল। কর্নেল আবার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি এই ঝোপের আড়াল থেকে ওই রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে তিনবার শিস দেবে। বোকামি কোরো না কিন্তু। সাবধান।"

বাড়িটার পেছনের পাঁচিল জায়গার-জায়গায় ধসে গেছে কবে। সেখানে ডালপালার বেড়া দেওয়া হয়েছে। একখানে বেড়া ঠেলে সরিয়ে কর্নেল ঢুকে গেলেন। বুক টিপটিপ করতে লাগল। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে বাগিয়ে ধরলাম এবং গুঁড়ি মেরে বসলাম। রাস্তাটার দিকে নজর রাখলাম।

তারপর কর্নেলের আর পাত্তা নেই। বসে আছি তো আছিই। অস্বস্তি যত, বিরক্তিও তত। কতক্ষণ পরে পেছনে কোথাও শুকনো পাতার মচমচ শব্দ এল। দ্রুত পিছু ফিরে দেখি, পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে একটা গাধা। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা। রামুর গাধাটা নয় তো?

গাধাটা অদৃশ্য হলে আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে দেখি কর্নেল যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই। সেই রিকশাটা এসে থামল। রিকশা থেকে রোগা চেহারার ধুতিপাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত নামলেন। অমনই তিনবার শিস দিলাম।

এতক্ষণে কর্নেল বেড়া গলে বেরিয়ে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, "কেটে পড়া যাক। চলে এসো।"

আমরা গুঁড়ি মেরে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুকুরের চারপাড়ে ঘন জঙ্গল। তলায় দামে ঢাকা খানিকটা জল। গাধাটা পিঠে বোঁচকা নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে জলজ ঘাস খাচ্ছে। কর্নেল গাধাটার দিকে প্রায় দৌড়ে গেলেন। ওঁর এই পাগলামি দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

উনি কাছে যেতেই গাধাটা এক লাফে পুকুরের ধারে-ধারে নড়বড় করে দৌড়তে থাকল। কর্নেল তাড়া করলেন। গাধাটা পাড়ের জঙ্গল ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল।

এবং কর্নেলও।

অগত্যা আমাকে দৌড়তে হল। পাশের জঙ্গলে ঢুকেছি, পেছন থেকে চেরা গলায় হাঁকডাক ভেসে এল, "চোর! চোর! ধর্! ধর্!"

একবার ঘুরে দেখে নিলাম, সেই রিকশাওলা আর সম্ভবত মোহন মাস্টার-

মশাই দৌড়ে আসছেন। কেলেঙ্কারিতে পড়া গেল দেখছি। জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে দেখলাম কর্নেল বা গাধা নেই। হলুদ ফুলে ঢাকা সরষে আর সবুজ ধানখেত এদিকটায়। ডান দিকে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা মন্দির। লুকিয়ে পড়ার জন্য সেদিকটায় দৌড়ে গেলাম। পেছনের চ্যাঁচামেচি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

হাঁফাতে-হাঁফাতে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম। তারপরে দেখতে পেলাম কর্নেলকে। চোখে বাইনোকুলার রেখে একটা উঁচু গাছের ডগায় কিছু দেখছেন। কাছে গিয়ে বললাম, "কী অদ্ভুত কাণ্ড আপনার।"

"ডার্লিং। আমার চেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করল রামুর গাধাটা। রামু পাগল হয়েছে। গাধাটার তো পাগল হওয়ার কথা নয়।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "আর একটু হলেই কেলেংকারি হত। সেই রিকশাওলা আর মোহনবাবু আমার পেছনে চোর-চোর, ধর-ধর বলে তাড়া করেছিলেন।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে ফেলেছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা তোমারই বোকামি। আমার পেছন-পেছন তোমারও দৌড়নো উচিত ছিল।" বলে কর্নেল চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন। "কুইক জয়ন্ত। আর এখানে নয়। গাধাটা এতক্ষণে ঝিলের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেছে।"

হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, "আমি কিন্তু গাধার পেছনে দৌড়চ্ছি না।"

"নাহ্। আপাতত গাধার পেছনে ছোটা নিরর্থক।"

সোজা এগিয়ে সেই পিচের রাস্তায় পৌঁছলাম দু'জনে! তারপর একটা খালি সাইকেল রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "জমিদারবাড়ি। তাড়াতাড়ি চলো ভাই।"

আকার-প্রকারে মনে হচ্ছিল, এসব বাড়িকেই হয়তো একসময় বলা হত সাতমহলা পুরী। কিন্তু এখন হতশ্রী অবস্থা। দেউড়ি আছে এবং মাথায় দুটো সিংহও আছে। কিন্তু সিংহের পেট ফুঁড়ে অশ্বত্থচারা গজিয়েছে। দারোয়ান থাকার কথা নয়। দু'ধারে পামগাছ এবং এবড়ো-খেবড়ো একফালি রাস্তা। পোর্টিকোর তলায় গিয়ে রিক্‌শা থেকে দু'জনে নামলাম। তারপর হলঘরের দরজায় দীপককে দেখলাম। বলল, 'আসুন, আসুন। ওপর থেকে আপনাদের দেখতে পেলাম। আবার কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?"

কর্নেল বললেন, "নাহ্। তোমার বাবা আছেন?"

"বাবা স্কুলে গেলেন একটু আগে। ম্যানেজিং কমিটির মিটিং আছে। উনি তো কমিটির সেক্রেটারি। ভেতরে আসুন।"

হলঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, "হালদারমশাইয়ের খবর কী?"

দীপক হাসল, "ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন! অদ্ভুত মানুষ!"

"আচ্ছা দিপু, তোমাদের পাতালঘরের চাবি কার কাছে থাকে?"

দীপক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভজুয়ার কাছে নীচের কিছু ঘরের চাবি থাকত। কারণ সেই-ই এসব ঘর দেখাশোনা করত। আসলে ভজুয়া যে-ঘরে থাকত, তার পাশে একটা ঘরে পুরনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ঠাসা আছে। ওই ঘরের কোণাতেই পাতালঘরে নামার গোপন সিঁড়ি আছে।"

"ঘরটা একটু দেখতে চাই। মানে সেই সিন্দুকটা।"

"এক মিনিট! মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসছি।"

একটু পরে সে চাবির গোছা নিয়ে ফিরে এল। গোলোকধাঁধার মতো কয়েকটা ঘরের ভেতর দিয়ে সেই ঘরটাতে নিয়ে গেল সে। দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। আবর্জনার মতো পুরনো চেয়ার-টেবিল-খাট ইত্যাদির স্তূপে ঘরটা ভর্তি। এক কোণে কাঠের আলমারি দাঁড় করানো আছে। দীপক সেটা ঠেলে সরাতেই একটা ছোট্ট দরজা দেখা গেল। সে দরজা খুলে গোপন সুইচ টিপে আলো জ্বালল। বলল, "আসুন।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট্ট একটা ঘরে পেঁছিলাম। কেমন ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। দেওয়ালে সিঁদুরের ছোপে একটা স্বস্তিকা আঁকা। তার নীচেই কালো কাঠের সিন্দুকটা খুলল দীপক। কর্নেলের পকেটে সব সময় টর্চ থাকে দেখছি। টর্চের আলোয় ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। ততক্ষণে দুর্গন্ধে আমি অস্থির। কর্নেল হঠাৎ ঝুঁকে একটা কালচে ছোট্ট জিনিস সিন্দুকের ভেতর থেকে তুলে নিলেন। উজ্জ্বল মুখে বললেন, "হুঁ! পাওয়া গেল তা হলে।"

দীপক বলল, "কী পাওয়া গেল কর্নেল?"

কর্নেল বললেন, "যা পাওয়া উচিত ছিল। চলো, বেরনো যাক এখান থেকে।"

॥ ৫ ॥

হলঘরে ফিরে কর্নেল বললেন, "এই জিনিসটার খোঁজে ম্যাজিকবাবুর ডেরায় হানা দিয়েছিলাম। তার ম্যাজিকের বাক্স-প্যাটরা তন্নতন্ন খুঁজে যখন পেলাম না, তখন বুঝলাম এটা হয়তো সিন্দুকের ভেতর থেকে গেছে। কাপালিকবেশী লোকটি যে-ই হোক, তাকে ম্যাজিকবাবু এটা দিলে প্রাণে মারা পড়ত না। ম্যাজিকবাবু ভজুয়ার সাহায্যে সিন্দুক থেকে তান্ত্রিক আদিনাথের কবন্ধ লাশের হাড়গোড় নিয়ে গিয়েছিল..."

দীপক চমকে উঠে বলল, "ভজুয়ার সাহায্যে? অসম্ভব।"

"সম্ভব ডার্লিং!" কর্নেল সোফায় বসে চুরুট ধরালেন। "যখের ধনের লোভ সবচেয়ে সাংঘাতিক লোভ। চিন্তা করে দ্যাখো। ওই পাতালঘর থেকে ভজুয়ার সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে কাজটা সম্ভব ছিল না। তোমার ঠাকুরদার বইয়ে লেখা আছে, কবন্ধ লাশ দুমড়ে-মুচড়ে কাপড়ে বেঁধে সিন্দুকে ঢোকানো হয়েছিল। এতকাল পরে কাপড় আস্ত থাকার কথা নয়। কাজেই হাড়গোড়গুলো আবার একটা কাপড়ে বা চটের থলেয় ভরে নিয়ে গিয়েছিল দু'জনে। এদিকে মাংস গলে পচে কাপড় গুঁড়ো হয়ে এই জিনিসটা সিন্দুকের তলায় খসে পড়েছে এবং সেঁটে গেছে।"

জিনিসটা কর্নেল দেখলেন। বাংলোয় দেখা আধখানা চাঁদের গড়ন সেই সিলের বাকি টুকরো বলে মনে হল। বললাম, "একটা গোটা সিল দু' টুকরো করার কারণ কী?"

কর্নের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "বইয়ে তান্ত্রিক আদিনাথের ছবি আছে। শিবের জটায় চন্দ্রকলার ছবি দেখেছ তো? ওঁর জটাতেও তেমনই আধখানা খুদে চাঁদের মতো জিনিস আছে। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। পরে দেখলাম ওঁর ডান বাহুতে তাগার মতো অবিকল একই জিনিস বাঁধা আছে। আতশ কাচে দুটোই পরীক্ষা করে বুঝলাম একটা খুদে সিলের দুটো টুকরো। কী সব খোদাই করা আছে ওতে! তখনই বুঝলাম তান্ত্রিক আদিনাথ যত বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁর ভাইপো হরনাথ – মানে, দিপুর ঠাকুরদাও তত বুদ্ধিমান ছিলেন। হরনাথ লিখেছিলেন, দেবী চণ্ডিকার ধনে লোভ করা উচিত নয়। বইয়ে 'ধ' হরফ এবং 'লো' হরফ পোকায় কেটেছে। তাই দিপুর বাবা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। দু-দুটো নরবলির পর ওঁর সন্দেহ হয়। তাই আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন!"

দিপু বলল, "বাপস্! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সেকালের লোকেরা কী অদ্ভুত ছিল!"

"হ্যাঁ। এখন তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু হরনাথ ধর্মপ্রাণ মানুষ। দেবী চণ্ডিকার ধনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বংশধরদের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। ওই ছড়াটা উনি তাই নিজেই রচনা করে লিখে গেছেন। ওর মধ্যে একটা সূত্র লুকানো আছে। সিলের আধখানা তো সিন্দুকে নিরাপদে রইল। বাকি আধখানা খুঁজে বের করার জন্য ওই ছড়া! কিন্তু ছড়াটা কাজে লাগেনি। জগাই জানত, মুণ্ডু কোথায় পোঁতা আছে।"

বললাম, "কিন্তু তান্ত্রিক আদিনাথকে বলি দিল কে?" কর্নেল হাসলেন। "ওটা গপ্প। আমার থিওরি হল, আসলে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর দেবী চণ্ডিকার লুকিয়ে রাখা ধন যাতে সহজে কেউ খুঁজে না পায় তাই হরনাথ একটা সাংঘাতিক কাজ করেছিলেন। মৃতদেহের মুণ্ডু কেটে কোথাও পুঁতে

রাখার জন্য…"

বাধা দিয়ে বললাম, "বোগাস। আপনার থিওরির মাথামুণ্ডু নেই। সিলের টুকরো দুটো লুকিয়ে রেখে গেলেই পারতেন! কোনও বদ্ধ পাগল ছাড়া মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারে না।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সাড়ে বারোটা বাজে। চলি দীপু! ওবেলা এসে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।"

দীপক হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে গিয়ে বললাম, "জগাই কী করে জানল কোথায় মুণ্ডু পোঁতা আছে?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি তো কথাটা শেষ করতেই দিলে না। আমি কি বলেছি হরনাথ নিজের হাতে তান্ত্রিক জ্যাঠার লাশের মুণ্ডু কেটেছিলেন? মড়া কাটার জন্য ওঁর একজন লোকের দরকার ছিল। জগাইরা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করে। হরনাথের বইয়ে একজনের উল্লেখ আছে। তার নাম গদাই। নিশ্চয় জগাইয়ের ঠাকুরদা বা তার বাবা। নামে নামে মিল। এদিকে তো পূর্বপুরুষের কোনও গোপন কথা বংশানুক্রমে পরিবারে চালু থাকে। এই পারবারেও ছিল। আমার থিওরি নিখুঁত, ডার্লিং!"

"কী করে অত নিশ্চিত হচ্ছেন?"

"জগাই একইভাবে খুন হয়েছে বলে!" কর্নেল গেট পেরিয়ে একটা সাইকেল রিকশা ডাকলেন। তারপর বললেন, "বাংলোয় ফিরে বুঝিয়ে দেব।"

বাংলোয় পেঁছে দেখি, হালদারমশাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললেন, "কাপালিকের ডেরা ডিস্‌কভার করেছি কর্নেল! গড়খাইয়ের ওপারে একটা গুহার মতো গম্বুজঘরে সে থাকে। কম্বলের তলায় ভাঁজকরা এই চিঠি ছিল।"

কর্নেল ওঁর হাত থেকে ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে বললেন, "দিপু আপনার জন্য ভেবে সারা। শিগগির গিয়ে ওকে দেখা দিন। আর শুনুন! একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। রামুর গাধার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা আছে। গাধাটা নয়, বোঁচকাটা খুব দরকার।"

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। "কই? কই সে?"

"খেয়েদেয়ে খুঁজতে বেরোবেন। ঝিলের জঙ্গলেই দেখা পেতে পারেন। কিছুক্ষণ আগে ওকে তাড়া করে ওদিকেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে উধাও হয়ে গেলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল ইনল্যান্ড লেটারটা পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিতে লেখা আছে ঃ

শঙ্করদা,

পত্রপাঠ চলে আসুন জগাই রাজি হয়েছে। ভজুয়াও রাজি। গতবারের

মতো সাধু সেজে আসবেন। শ্মশানতলায় থাকবেন। মা চণ্ডীর কৃপায় এবার আর ব্যর্থ হব না। প্রণাম রইল। ইতি—

শচীন

নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা! 'শ্রী এস. এন. ভট্টাচার্য'। কেয়ার অব জয়চণ্ডী অপেরা। ৩৫/১, ঠাকুরপাড়া লেন, কলকাতা-৮।

বললাম, "যাত্রাদলের লোক?"

কর্নেল হাসলেন। "তাই তো মনে হচ্ছে। তার পক্ষে কাপালিক সাজা সহজ। এবার এই চিরকুটটা দ্যাখো। ম্যাজিকবাবু শচীন হাজরার বাক্সে পেয়েছি।"

চিরকুটটা দেখেই বললাম, "আমাকে যে চিরকুটটা ছুঁড়ে কাল বিকেলে ভয় দেখিয়েছিল, তারই লেখা। ম্যাজিকবাবুকে শ্মশানতলায় ডেকেছিল দেখছি। তলায় ইংরেজিতে 'এস' লেখা সেই শঙ্করদা!"

"হ্যাঁ। জগাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, 'এসে গেছি।' যাই হোক, এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।" বলে কর্নেল তাঁর কিট্‌ব্যাগ থেকে প্যাড বের করে আঁকজোক শুরু করলেন। তারপর বললেন, "এটা একটা ওলটানো ত্রিভুজ।"

...'এ' বিন্দু ভজুয়া, 'বি' বিন্দু জগাই এবং 'সি' বিন্দু ম্যাজিকবাবু শচীন হাজরা, মাঝখানে 'ডি' বিন্দু হল শঙ্কর নামে একটা লোক। যে-কোন কারণেই
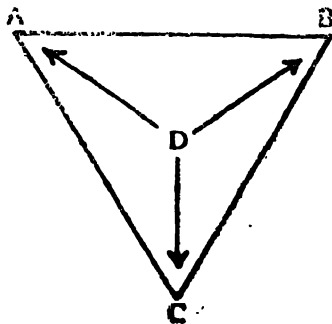
হোক শঙ্কর প্রকাশ্যে কঙ্কগড়ে আসতে পারে না। অথচ সে দেবী চণ্ডিকার গুপ্তধন-রহস্য জানে। সে তিনজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। এতদিন পরে সে ম্যাজিকবাবুর সাহায্যে প্রথমে তান্ত্রিক আদিনাথের ধড় হাতাল। কিন্তু সিলের অর্ধাংশ পেল না। তখন ম্যাজিকবাবু ওটা হাতিয়েছে সন্দেহ করে তাকে খতম করল। তারপর জগাই মুণ্ডু উদ্ধার করে দিলে। কিন্তু মুণ্ডুতেও সিলের বাকি আধখানা নেই। থাকবে কী করে? মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সন্দেহক্রমে খাপ্পা হয়ে সে জগাইকে খতম করল। কারণ সে ধরেই

নিয়েছিল গুপ্তধনের লোভে তাকে ওরা ফাঁকি দিচ্ছে। বাকি রইল ভজুয়া। আমার ধারণা, ভজুয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল শংকর। নিশ্চয় ওকে লোভ দেখিয়ে বাগে এনেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও সন্দেহক্রমে খতম করেছে। গুপ্তধনের লোভ পেয়ে বসলে মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। তিন-তিনজনকে সে অবশ করে দেবী চণ্ডীকার থানে এনে বলি দিয়েছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি। দিপুর বাবা গোয়েন্দা এনেছেন কলকাতা থেকে, সে জেনে গিয়েছে। তাই ভেবেছে, গোয়েন্দার ওপর বাটপাড়ি করবে। আসলে আমাদের হালদারমশাই অতি-উৎসাহে—ঠিক তোমার মতোই···"

বাধা দিয়ে বললাম, "জ্যান্ত কঙ্কাল চোখের সামনে নাচতে দেখলে মাথার ঠিক থাকে না।"

কর্নেল সেই কালো আধখানা সিলটা লোশন দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকলেন। বললেন, "আজ পূর্ণিমা। আজ রাতে আবার কঙ্কালের নাচ দেখাব তোমাকে। শিওর!"

দুপুরে আমার ভাতঘুমের অভ্যাস আছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। কর্নেল সিলের টুকরো দুটো জোড়া দিয়েছেন। বললেন, "একপিঠে দেবী চণ্ডিকার রণমূর্তি। অন্যপিঠে শুধু স্বস্তিকাচিহ্ন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। গুপ্তধনের সূত্র কোথায়? দেবী চণ্ডিকা আর স্বস্তিকা।" কর্নেল টাকে হাত বোলাতে থাকলেন। চোখ বুজে গেল।

একটু পরে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। বললাম, "গুপ্তধনটা গুলতাপ্পি নয় তো?"

"কিছু বলা যায় না। যাক্‌গে, চলো। বেরনো যাক।"

"গুপ্তধনের খোঁজে?"

"নাহ্‌। থানায়।"

"থানায় যেতে আমার ভাল লাগে না। আপনি যান।"

কর্নেল উঠে দরজার কাছে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বরং তুমি রামুর গাধাটা ধরতে হালদারমশাইকে সাহায্য করতে পারো। ওই দ্যাখো, ঝিলের দক্ষিণের ঘাটে হালদারমশাই ওত পেতে বসে আছেন।"

বারান্দায় গিয়ে দেখি, সত্যি তা-ই। হালদারমশাই ঘাটের পাশে একটা ঝোপের ধারে বসে আছেন! গাধাটা দেখতে পেলাম না। কর্নেল চলে যাওয়ার পর রঘুলালকে ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তায় নেমেছি, হালদারমশাইয়ের চিৎকার শোনা গেল।

"জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! গাধা! গাধা!"

পিঠে বোঁচকাবাঁধা গাধাটা জঙ্গল ফুঁড়ে ছুটে আসছিল। আমি দু'হাত

তুলে এগিয়ে যেতেই ঝিলের ঢালে নেমে গেল। তারপর দিব্যি জলজঘাসের দিকে মুখ বাড়াল। আমি রঘুলালকে ডাকলাম। সে দৌড়ে এল। বললাম, "গাধাটা ধরতে হবে। বকশিশ পাবে রঘুলাল।"

হালদারমশাই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "গাধা কয় আর কারে!"

রঘুলাল একটা মজার কাজ পেয়ে গেল যেন। সে বলল, "চেঁচামেচি না করে তিনজনে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরতে হবে সার। রামুর গাধাটা খুব বদমাশ! লাথি ছুঁড়তে পারে।"

হালদারমশাই বললেন; "দড়ি লও রঘুলাল! আমার কাছে দড়ি আছে।"

রঘুলাল দড়ি নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোলো। বললাম, "দড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন নাকি?"

হালদারমশাই হাসলেন। "নাহ্। কাইল রাত্রে কাপালিক আমারে এই দড়ি দিয়া বাঁধছিল না?"

রঘুলাল চাপা গলায় বলল, "আপনারা দু'দিকে রেডি থাকুন সার!"

সে কাছাকাছি যেতেই গাধাটা ঘুরল। অমনই রঘুলাল তার গলায় দড়ির ফাঁস আটকে দিল। হালদারমশাই এবং আমি গিয়ে দড়ি ধরে ফেললাম। টাগ অব ওয়ারে শেষপর্যন্ত গাধাটা পরাস্ত হয়ে ঘাসে পড়ে গেল। হালদারমশাই তার পিঠ থেকে বোঁচকাটা খুলে নিয়ে বললেন, "খুব জব্দ এবার। রঘুলাল! ওকে ছেড়ে দাও! কিন্তু ইস্‌স্‌! বোঁচকাটায় কী বিটকেল গন্ধ!"

গাধা বেচারা গলায় দড়ির ফাঁস নিয়ে নড়বড় করে দৌড়ে রাস্তায় উঠল। বুঝলাম, বুদ্ধিমান গাধা। জঙ্গলে ঢুকলে দড়িটা কোথাও আটকে গিয়ে বিপদে পড়ত।

হালদারমশাই বাংলোয় এলেন আমার সঙ্গে। কর্নেল নেই শুনে নিরাশ হলেন। বোঁচকা থেকে সত্যি বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। সেটা এনে ফেলে রেখে বারান্দায় বসলাম আমরা। রঘুলাল কফি করতে গেল। হালদারমশাই সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "বোঁচকায় কী আছে যে, এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গাধার পিঠে এটা বাঁধলই বা কে?"

হাসতে-হাসতে বললাম, "খুলে দেখুন না! গুপ্তধন থাকতেও পারে।"

হালদারমশাইয়ের ধৈর্য রইল না আর। উঠে গিয়ে নোংরা কাপড়ের বোঁচকাটা খুলে ফেললেন। তারপর লাফিয়ে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! মড়ার খুলি আর হাড়গোড়ে ভর্তি।"

চমকে উঠেছিলাম। বুক ধড়াস করে উঠেছিল। বললাম, "এই সেই তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল।"

বোঁচকাটা ঝটপট বেঁধে হারদারমশাই বললেন, "আপনি কাইল রাত্তিরে দেখছিলেন, একটা কঙ্কাল আমারে বলি দিতে চাইছিল? হেই ব্যাটাই! কিন্তু

খড়্গ গেল কই ?"

বললাম, "কাপালিকের কাছে।"

"হঃ। ঠিক কইছেন।" বলে হালদারমশাই বারান্দায় এলেন। ধপাস করে বসে জোরে শ্বাস ছাড়লেন। বোঝা গেল, এতক্ষণে উনি বেজায় উত্তেজিত।

একটু করে কফি খেতে-খেতে আমরা গুপ্তধন রহস্য নিয়ে আলোচনা করছি, রঘুলাল ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং লনে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে ঝিলের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বলল, "কর্নেলসাব আসছেন। ওই দেখুন।"

ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর কর্নেলকে হন্তদন্ত আসতে দেখলাম। হালদার-মশাই হন্তদন্ত গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গেটের নীচে কর্নেলের টুপি দেখা গেল। হালদারমশাই জয়ের উল্লাসে বলে উঠলেন, "বোঁচকার ভেতর স্কেলিটন অ্যান্ড স্কাল!"

সাড়ম্বরে ঘটনার বিবরণ দিতে-দিতে হালদারমশাই কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর বারান্দায় ফিরে এলেন। রঘুলাল আবার কফি করতে গেল। বললাম, "গেলেন তো থানায়। ফিরলেন জঙ্গল থেকে। নিশ্চয় অর্কিড খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন না জঙ্গলে ?"

কর্নেল হাসলেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ। বললেন, "ফাঁদ পাততে গিয়েছিলাম।"

"কিসের ফাঁদ ?"

"কাপালিক ধরার। হালদারমশাই ওর ডেরার খোঁজ দিয়েছেন। সেই ডেরায় ঢুকে গুপ্তধনের সূত্র অর্থাৎ সিলটা রেখে এলাম। সঙ্গে একটা চিঠি। সন্ধ্যা সাতটায় ঝিলের পুবের ঘাটে বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনে দেখা করতে লিখেছি। শর্ত দিয়েছি, গুপ্তধনের আধাআধি বখরা চাই। দেখা যাক টোপ গেলে কি না। গুপ্তধনের লোভ অবশ্য সাঙ্ঘাতিক।"

অবাক হয়ে বললাম, "সিলটা রেখে এসেছেন! করেছেন কী!"

কর্নেল চাপা স্বরে সকৌতুকে বললেন, "বলেছি ডার্লিং, আজ রাতে কংকালের নাচ দেখব। আর হালদারমশাই স্বচক্ষে দেখবেন তাঁকে কে বলি দেবে বলে শাসাচ্ছিল।"

হালদারমশাই বললেন, "সে-ব্যাটা তো ওই বোঁচকার ভেতর বাঁধা আছে।"

"হালদারমশাই! প্রেতাত্মা তার কংকালসুদ্ধু বোঁচকা থেকে বেরিয়ে পড়বে। যাই হোক, রঘুলালকে দিয়ে ওটা আপাতত বাথরুমে রাখতে হবে। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। পোনে সাতটায় আমরা বুড়ো শিবমন্দিরের ওখানে পেঁছিব।"

একটা চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে পেঁছিতে গেলে যা হয়। সময় যেন কাটতে চায় না। সাড়ে ছ'টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তা দিয়ে ঘুরে

ঝিলের উত্তর পাড় ধরে কর্নেল এগোলেন। স্তূপ, খানাখন্দ, ঝোপঝাড় পেরিয়ে মোটামুটি ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সবে চাঁদ পুবের গাছপালার মাথা আলো করে উঁকি দিচ্ছে। হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আরে! এখানেই তো কাপালিক মাটি খুঁড়ছিল।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। খুলি পোঁতা ছিল এখানেই। ওই দেখুন, বুড়ো শিবের মন্দির। চুড়োয় একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে।"

এই সময় কাছাকাছি কেউ বলে উঠল, "এসে গেছি কর্নেল!"

"চলে এসো দীপু!"

দীপক একটা স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। হাতে সেই বল্লম আর টর্চ। কর্নেল আমাদের নিয়ে ফাঁকা জমিটায় গেলেন। তারপর বললেন, "সবাই মন্দিরের আড়ালে যাও। কুইক! দিপু, এদের নিয়ে যাও। সাবধানে! টু শব্দটি করবে না।"

কতকালের পুরনো মন্দির। তার একপাশে ঘন ছায়ায় আমরা তিনজনে বসে রইলাম। কর্নেল ফাঁকা জমিটায় পায়চারি করছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, একটু পরে ওঁকে সেই ছড়াটা আওড়াতে শুনলাম। ছড়াটা বার-দুই আওড়েছেন, কেউ খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠল, "ওঁ, হ্রীং ক্লীং ফট্!" তারপর দপ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। পেছনে ঘন ঝোপ। ঝোপের মাথায় মশালটা আটকানো মনে হল।

হঠাৎ ঝোপ ডিঙিয়ে একটা আস্ত নরকঙ্কাল লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল। তার দু'হাতে ধরা একটা চকচকে খাঁড়া নেড়ে তেমনই ভুতুড়ে গলায় বলল, "এসেছিস? আয়, আয়! কাছে আয়।"

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দেবী চণ্ডিকার গুপ্তধন কি উদ্ধার হয়নি?"

"কাছে আয়। কথা হবে।"

"আর কিসের কথা মশাই? সিল তো পেয়ে গেছেন।"

কঙ্কাল খাঁড়া নামিয়ে বলল, "চালাকি? আমি কে জানিস? আমি তান্ত্রিক আদিনাথ। আমার দেবীর ধন। আমার সঙ্গে ফক্কুড়ি? তবে রে ব্যাটা বুড়ো টিকটিকি!"

এবার যেন কর্নেলেরই আমার মতো মাথা খারাপ হয়ে গেল। টিকটিকি বলার জন্যই কি খেপে গেলেন? রিভলবার বের করে দৌড়ে গেলেন। কঙ্কালটা তড়াক করে ঝোপ ডিঙিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। ঝোপে আটকে গেল। তারপর হঠাৎ ঝোপের ওপাশে অনেক টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ধুপধাপ, দুদ্দাড়, ছুটোছুটি শব্দ। আমরা দৌড়ে কর্নেলের কাছে গেলাম। কর্নেল সেই কঙ্কালটা ঝোপের ডগা থেকে নামিয়ে এনে বললেন, "ম্যাজিকবাবুর ম্যাজিক

কঙ্কাল! ম্যাজিকের স্টেজে পুতুলনাচের কৌশলে পেছন থেকে প্লাস্টিকে তৈরি কঙ্কালটাকে দড়ির সাহায্যে কন্ট্রোল করা হত। হুঁ, খাড়াটা দেখছি পিসবোর্ডে মোড়া রাংতার। বলে হাঁক ছাড়লেন, "কই মিঃ ধাড়া! আপনার আসামী কোথায়?"

ঝোপের পেছন থেকে সাড়া এল, "বড্ড বেয়াড়া আসামি! এক মিনিট কর্নেল!"

তারপর সদলবলে বেরিয়ে এলেন সত্যিকার খাঁড়া হাতে এক দারোগাবাবু। তাঁর পেছনে কনস্টেবলরা লাল কাপড়পরা এক কাপালিককে বেঁধে নিয়ে এল। দারোগাবাবু বললেন, "খাঁড়াটা দেখেছেন? হাতে এটা ছিল বলেই অ্যারেস্ট করতে একটু দেরি হল।"

কর্নেল কাপালিকের জটাজুট এবং গোঁফদাড়ি হ্যাঁচকা টানে খুলে দিয়ে টর্চ জেলে বললেন, "দ্যাখো তো দিপু, লোকটাকে চিনতে পারো কি না?"

দীপু অবাক হয়ে বলল, "এ কী! শঙ্করকাকা না?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবার জ্ঞাতিভাই শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তুমি তখন আসানসোলে কলেজ-স্টুডেন্ট। তোমার বাবার কাছে জেনে নিয়ো কী সাঙ্ঘাতিক আর জঘন্য চরিত্রের লোক এই শঙ্করনাথ। মিঃ ধাড়া! আসামি নিয়ে থানায় চলুন। আমি পরে দেখা করব।"

দারোগাবাবু এবং কনস্টেবলরা আসামি নিয়ে চলে গেলেন। হালদারমশাই কঙ্কালটা পরীক্ষা করছিলেন। খি-খি করে হেসে বললেন, "কী কাণ্ড! আমি ভাবছিলাম বোঁচকা থেকে বেরিয়ে—খি-খি-খি!"

বললাম, "কিন্তু ওই অদ্ভুত ছড়াটার মানে কী?"

কর্নেল, বললেন, "ওই দ্যাখো, 'বার-পনেরো-চাঁদা' উঠেছে। বুড়ো শিবের ত্রিশূলের ছায়া কোথায় পড়েছে লক্ষ্য করো! ওখানে খুলিটা পোতা ছিল। হুঁ, গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিই। 'আঁটঘাট বাঁধা' নয়, কথাটা হল আটঘাট বাঁধা। এই ঝিলের চারদিকে বাঁধানো ঘাট আছে। বুড়ো শিবের মন্দির তো দেখতেই পাচ্ছ। 'বার পনেরো চাঁদা' মানে বারো নম্বর মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস। 'পনেরো' হচ্ছে চাঁদের পঞ্চদশী তিথি। তার মানে চৈত্র মাসের পূর্ণিমার চাঁদ যখন বুড়ো শিবের ত্রিশূলের মাথায় দেখা যাবে, ত্রিশূলের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই খুলি পোঁতা আছে। তাই ছড়ায় আছেঃ 'বুড়ো শিবের শূলে। আমার মাথায় ছুঁলে।' কিন্তু চূড়ার জট ছাড়ানোর আগেই জগাই খুলির খোঁজ দিয়েছিল শঙ্করনাথকে।

"গুপ্তধনের কী হল?"

"তুমি ভুলে গেছ জয়ন্ত, পাতালঘরের দেওয়ালে আমরা সিঁদুরে আঁকা

স্বস্তিকাচিহ্ন দেখেছি। সিলের একপিঠে স্বস্তিকা আছে। অন্যপিঠে দেবী চণ্ডিকার মূর্তি। ওই মূর্তিটাই গুপ্তধন। প্রায় এক কেজি ওজনের সোনার দেবীমূর্তি। থানায় খবর দিয়ে দিপুদের বাড়ি গিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। স্বস্তিকা আঁকা ছিল যেখানে, সেখানে খুঁড়তেই সোনার মূর্তি পাওয়া গেল। কাজেই সিলটা শঙ্করনাথের ডেরায় রেখে এসেছিলাম। ওটাই ফাঁদ। বুঝলে তো ?

হালদারমশাই উদাস চোখে চাঁদ দেখছিলেন। বললেন, "চলেন কর্নেলসার। বাংলোয় গিয়া বোঁচকাটা দেখা দরকার।"

কর্নেল কঙ্কালটা দিব্যি ভাঁজ করে গুটিয়ে বললেন, "বোঁচকা আছে। শঙ্করনাথ-তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল আর খুলিতে সিল না পেয়ে খাপ্পা হয়ে ওটা রামুর গাধার পিঠে বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু গাধাটাকে এই কাজে লাগাতে হলে রামুকে ভয় দেখিয়ে ঘাট থেকে তাড়ানো দরকার ছিল। তাই ম্যাজিকবাবুর কঙ্কাল দেখিয়ে বেচারাকে ভাগিয়ে দেয়। আস্ত কঙ্কালের নাচ দেখে রামুর পাগল হওয়া স্বাভাবিক। তবে এবার ওকে সুস্থ করা যাবে।"

আমরা বাংলোয় ফিরে চললাম।

ইয়ক্তাগিদের

গ্রহে
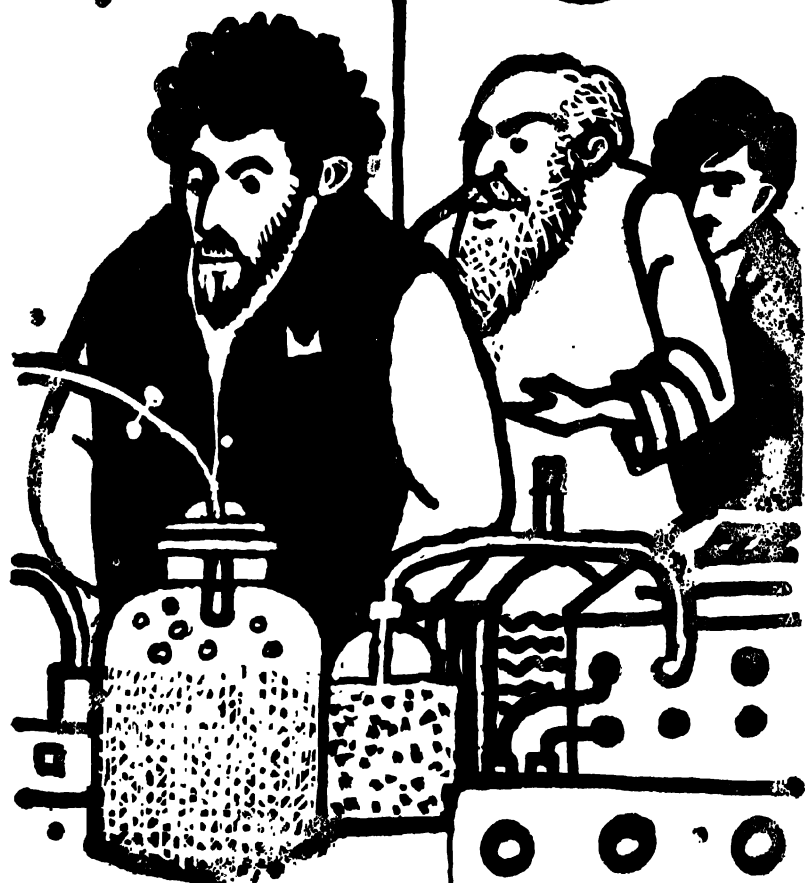
প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' সবেগে ঘরে ঢুকে সশব্দে সোফায় বসে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলেন, "অসম্ভব!" অবিশ্বাস্য! অদ্ভু-উ-ত!"

তাঁর চোখ দুটো গুলি-গুলি এবং গোঁফের ডগা তির তির করে কাঁপছিল। এ-পকেট ও-পকেট খোঁজাখুঁজি করে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ফ্যালাইয়া আইছি।"

বুঝলাম জিনিসটা নস্যির কৌটো। উত্তেজনার সময় ওঁর মুখে মাতৃভাষা বেরিয়ে আসে। তাছাড়া খানিকটা নাটুকে স্বভাবের মানুষও বটে। সামান্য ব্যাপারে তিলকে তাল করে ফেলেন। পেশাদার গোয়েন্দা হওয়ার দরুণ সবসময় সবকিছুতে সন্দিগ্ধ হয়ে রহস্য খোঁজেন।

বিশালদেহী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুজে সম্ভবত কোনও দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতি দেখছিলেন এবং সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সেটির জৈব গোত্র বিচার করছিলেন। জানালা দিয়ে ছিটকে পড়া রোদ্দুরে ওঁর চওড়া টাক ঝকমক করছিল। বললেন, "অদ্ভুতের সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক আছে হালদারমশাই!"

"হঃ! ঠিক কইছেন।" হালদারমশাই সোজা হয়ে বসলেন। ভূত। ভূত!"

হাসি চেপে বললাম, "কোথায় দেখলেন হালদারমশাই?"

হালদারমশাইয়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, "চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে সার্ভিস করছি। রিটায়ার্ড লাইফে প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাজেন্সি খুলছি। ড্যাঞ্জারাস-ড্যাঞ্জারাস ক্যাস হাতে লইছি। কখনও ভূত দেখি নাই। কাইলই রাত্রে স্বচক্ষে দেখলাম।"

"ভূত দেখলেন?"

"হঃ! ভূত ছাড়া কী? নিজের একখান চক্ষু খুইলা বেসিনে রাখল। জলে ধুইয়া ফের পইরা লইল।"

হাসতে-হাসতে বললাম, "নকল চোখ বা নকল দাঁত অনেকেই পরেন।"

হালদারমশাই চটে গিয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবু! আমি পোলাপান না; বেসিনের জলে রক্ত দেখছি।"

ভূতের শরীরে রক্ত থাকে নাকি?"

হালদারমশাই আরও খাপ্পা হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। ওঁর জন্য স্পেশাল কফি অর্থাৎ তিনভাগ দুধ একভাগ লিকার। উনি কফির দিকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু এতক্ষণে চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে

নিলেন। অভ্যাসমতো আওড়ালেনও "কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডারউইনসায়েবের বিবর্তনবাদ ভূতের ক্ষেত্রেও খাটে ডার্লিং! নিয়ানডরথাল মানুষ থেকে ক্রোম্যাগনন মানুষ। তা থেকে হোমো-সাপিয়েন-সাপিয়েন, আমরা যে-মানুষ। সেইরকম আদিম ভূত থেকে বর্তমান ভূত। এ-ভূতের রক্তও থাকতে পারে। হলিউডে তৈরি সায়েবভূতের ছবি দেখেছ। ড্রাকুলার ভূত রক্তচোষা ভূত ছিল। দিশি ভূত ঘাড় মটকাত। কিন্তু রক্ত খেত না। বিলিতি ভূতের চরিত্রই অন্যরকম। তারা যেমন রক্ত খায়, তেমনই তাদের শরীরে রক্তও থাকে। আধুনিক সায়েবভূত কীরকম, চিন্তা করো!"

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে কফি খাচ্ছিলেন। বললেন, "কর্নেলসার! ঠিক ধরেছেন। লোকটার চেহারা সাহেবগো মতো।"

এবার একটু আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, "ব্যাপারটা খুলে বলুন তো হালদার-মশাই!"

কফি শেষ করে হালদারমশাই যা বললেন তা মোটামুটি এই ঃ

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি দমদম এলাকায় এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত প্রায় দশটা হয়ে যায়। যশোর রোডের মোড়ে ট্যাক্সি বা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। শীতের রাত। ঘন কুয়াশা। রাস্তাঘাট সুনসান নিঝুম। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর পাশ দিয়ে একটা লোক রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার মধ্যিখানের আইল্যান্ডে বাগান করেছে পুরসভা। ঝোপঝাড়ে কালো হয়ে আছে। লোকটা সেখানে যেতেই কেউ সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ল। অমনই লোকটা তাকে দু' হাতে ধরে ওপরে তুলে আছাড় মারল। তারপর হনহন করে এগিয়ে ওপারের একটা বাড়ির গেটে ঢুকে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা।

পর-পর কয়েকটা গাড়ি চলে যাওয়ার পর হালদারমশাই দৌড়ে গেলেন। আবছা আলোয় দেখলেন, দলাপাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ফুটপাত ঘেঁষে পড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ হলে চ্যাঁচামেচি করে লোক ডাকত। কিন্তু হালদারমশাই স্বভাব-গোয়েন্দা। তাই সেই শক্তিমান লোকটার খোঁজেই ছুটে গেলেন।

গেটটা জরাজীর্ণ এবং ভেতরে প্রায় একটা জঙ্গল। তার ভেতর হানাবাড়ির মতো একটা দোতলা বাড়ি। ছায়ার আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে হালদারমশাই পাঁচিল ডিঙোলেন। আগাছার জঙ্গলে ঢুকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ নীচের একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

সাহস করে এগিয়ে একটা খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, সেই লোকটা বাথরুমে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

একটা চোখ রক্তাক্ত। হালদারমশাই বুঝলেন, আততায়ীর গুলি তার চোখেই লেগেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সে সেই চোখটা উপড়ে নিয়ে বেসিনের ট্যাপ খুলে ধুল। চোখের গর্ত থেকে সম্ভবত খুদে গুলিটাও টেনে বের করে ফেলল। তারপর চোখটা আবার পরে নিল।

দৃশ্যটা শুধু ভয়ঙ্কর নয়, বীভৎসও। এই পর্যন্ত দেখে হালদারমশাইয়ের নার্ভের অবস্থা শোচনীয়। তিনি আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে পালিয়ে এলেন। ততক্ষণে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। গাড়ি চাপা পড়ে দুর্ঘটনা ধরে নিয়েই তারা উত্তেজিত। কিন্তু গোয়েন্দার স্বভাব। হালদারমশাই গুলির শব্দ শুনেছেন। তাই আগ্নেয়াস্ত্রটি খুঁজছিলেন। একটু পরে তা দেখতেও পেলেন। পয়েন্ট ২২ ক্যালিবারের কালচে রঙের রিভলবারটা পড়ে আছে হাত তিরিশেক দূরে ফুটপাতের ওপর। লোকের চোখ এড়িয়ে সেটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর গ্যারাজগামী একটি বাস দৈবাৎ পেয়ে গেলেন।

সারারাত ঘুমোতে পারেননি হালদারমশাই। পুলিশকে জানাতে ভরসা পাননি। কারণ তাঁকে নিয়ে পুলিশমহলে প্রচুর ঠাট্টাবিদ্রূপ চালু আছে। তা ছাড়া নিজেই এই রহস্যের সমাধান করার লোভ রয়েছে। তাই ভেবেচিন্তে 'কর্নেলসারের' লগে কনসাল্ট করতে এসেছেন।...

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। দাঁতের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট। বললেন, "সাহেবের মতো চেহারা?"

হালদার মশাই বললেন, "কতকটা মানে, মড়ার মতো দেখতে। মাথায় ঝাঁকড়া চুলগুলি কেমন লালচে। গড়নে আমার মতো লম্বা। তবে রোগাও না, মোটাও না।"

"বয়স অনুমান করতে পারেন?"

হালদারমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবুর কাছাকাছি হইব।"

"তা হলে যুবক বলা চলে।"

"হঃ! জয়ন্তবাবুর মতোই গোঁফদাড়ি কিছুই নাই।"

"পোশাক?"

"প্যান্ট সোয়েটার। সোয়েটারের রং ব্লু—সরি! নেভিব্লু।" বলে হালদার-মশাই জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে খুদে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল রিভলভারটি কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর বললেন, "সিক্স-রাউন্ডার চিনে অস্ত্র। কাজেই চোরা বেআইনি জিনিস। এটা আমার কাছে রাখতে আপত্তি আছে হালদারমশাই?"

হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ্। তবে কর্নেলসার, এখনই সেই বাড়িটা চেক করনের দরকার। চলেন, যাই গিয়া।"

উৎসাহের সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেই সময় ডোর-বেল বাজল। ষষ্ঠী একটু পরে একটা নেমকার্ড এনে বলল, "এক সায়েব বাবামশাই! বেরৎ নাক।"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, "নিয়ে আয়।" তারপর অস্ত্রটি টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকালেন।

হালদারমশাই ধপাস করে বসে পড়েছিলেন। আমিও একটু চমকে উঠেছিলাম। সায়েবভূতের কথা শোনার পর 'বেরৎ' অর্থাৎ কিনা বৃহৎ নাক-ওয়ালা সায়েবের আবির্ভাবে বুক ধড়াস করে ওঠারই কথা। হালদারমশাই গুলি-গুলি নিষ্পলক চোখে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল কার্ডটা টেবিলে রেখে বললেন, "পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত ম্যাডান জুয়েলার্সের মালিক এফ এস ম্যাডান।"

হালদারমশাই আশ্বস্ত হয়ে শ্বাস ছাড়লেন। আমিও।

স্যুটপরা ঢ্যাঙা রোগাটে গড়নের এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করে ইংরেজিতে বললেন, "আমি কর্নেলসায়েবের সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলতে চাই।"

"হিরেচুরি সম্পর্কেই কি?"

ম্যাডান একটু হেসে বললেন, "তা হলে আমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।"

"আপনি বসুন। তবে কী অর্থে আমাকে ঠিক লোক বললেন, জানি না। আপনার বাড়ির গোপন বেসমেন্টে রাখা ইস্পাতের ভল্ট থেকে ১৮২ ক্যারেটের একটা হিরে চুরির খবর গত মাসে কাগজে সবিস্তার বেরিয়েছিল। আপনার দাবি, হিরেটি নাকি ঐতিহাসিক।"

ম্যাডান আমাদের দেখে নিয়ে বললেন, "আমার কিছু গোপন কথা আছে।"

কর্নেল আমাদের দুজনের পরিচয় দিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, "আপনার গোপন কথা এঁদের কাছে আমি গোপন রাখতে পারব না, মিঃ মাদান। কাজেই—"

ম্যাডান ওঁর কথার ওপর বললেন, "কী বললেন? মাদান? আপনি তা হলে পারসি ভাষা জানেন?"

"সামান্যই। ম্যাডান স্ট্রিট যাঁর নামে, তিনিও আপনাদের জোরাস্তারি ধর্মের লোক ছিলেন। বাঙালি বসু যেমন ইংরেজিতে বোস হয়েছেন, মাদানও তেমনি ম্যাডান। যাই হোক, বলুন আপনার গোপন কথা।"

ম্যাডান একটু ইতস্তত করে বললেন, "একমাস হয়ে গেল, পুলিশ কিছু করতে পারল না। ফোরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, লেসার রশ্মি দিয়ে ইস্পাতের ভল্টের একটা অংশ গলিয়েছে চোর। বেসমেন্টে ঢোকার গোপন

দরজার লকও গলিয়েছে। এই পর্যন্তই।"

"আপনি বলেছেন, হিরেটা ঐতিহাসিক। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"পারসিক সাসানীয় বংশের শেষ সম্রাট ইয়াজ্‌দাগির্দের মুকুটে এই হিরে বসানো ছিল। তিনিও আমাদের জোরাস্তারি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্তমান বাগদাদের কিছু দূরে হিরার যুদ্ধে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনি আরবদের হাতে পরাজিত হন। তাঁর মুকুট থেকে পবিত্র হিরেটি খুলে নিয়ে পালায় তাঁর এক অনুচর। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রায় সাড়ে তেরশো বছর এ-হাত ও-হাত ঘুরে হিরেটি যায় এক ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের হাতে। তাঁর বংশধর গত জুন মাসে নিউ ইয়র্কের নিলামঘরে সেটি বেচতে দেন। ১২ লক্ষ ডলারে আমার এজেন্ট কিনে নেন। বিশ্বের সব বড় নিলামকেন্দ্রে আমার এজেন্ট আছেন।" ম্যাডান একটু দম নিয়ে বললেন, "দুঃখের কথা কী জানেন কর্নেল সরকার? এই অধম ফিরুজ শাহ্‌ মাদানেরই পূর্বপুরুষ সম্রাট ইয়াজ্‌দাগির্দের সেই অনুচর। প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যও আপনাকে দেখাতে পারি।"

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বলুন, আমি কী করতে পারি?"

ম্যাডান করুণ মুখে বললেন, "পবিত্র হিরে আপনি উদ্ধার করে দিন। এর জন্য যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, পুলিশের পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য।"

"নিউ ইয়র্কের নিলামঘরে আপনার এজেন্টের নাম কী?"

"টেডি পিগার্ড। খুব বিশ্বস্ত লোক। জমিজমা-সম্পত্তির কারবারি। আবার অন্যের হয়ে নিলামঘরে হরেকরকম জিনিস নিলামেও ডাকেন। বলা দরকার কর্নেলসায়েব, আমার মতো ওঁর অনেক মক্কেল আছেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে মক্কেলদের সঙ্গে ওঁর বোঝাপড়া আছে। কোন্‌ জিনিস কোন্‌ মক্কেলের হয়ে নিলামে কিনতে চাইছেন বা কেনেন, তা পিগার্ড এবং সেই মক্কেল ছাড়া ঘুণাক্ষরে আর কেউ জানতে পারবে না। পিগার্ড তা জানাবেন না। আপনি তো জানেন, ব্যবসাবাণিজ্যে কিছু নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।"

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বলে উঠলেন, "হঃ! ট্রেড সিক্রেট।"

"ট্রেড সিক্রেট!" সায় দিলেন ম্যাডান। "এভাবে বহু রত্ন আমি পিগার্ডের মারফত কিনেছি। প্রায় কুড়ি বছরের যোগাযোগ তাঁর সঙ্গে। এই পবিত্র হিরে যে নিলামে বিক্রি হবে, তা পিগার্ডই আমাকে জানিয়েছিলেন। তার কারণ বুঝতেই পারছেন। জোরাস্তারি সম্রাটের মুকুটের হিরে এবং আমিও একজন জোরাস্তারি। তো শুনেই আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম।

আমাদের পরিবারে বংশপরম্পরা এই হারানো হিরের কাহিনী চালু আছে। আমার ঠাকুরদার হাতে লেখা বৃত্তান্তে এর উল্লেখ আছে। খবর পেয়েই চলে গেলাম নিউ ইয়র্ক। পিগার্ডকে বললাম, এই হিরে আমার চাই। চিন্তা করুন কর্নেলসায়েব, এ-যাবৎকাল সর্বোচ্চ দরে ওই নিলামঘরে একটুকরো হিরে বিক্রি হল। রেকর্ড দর!"

কর্নেল বললেন, "পিগার্ডকে আপনি বলেছিলেন হিরেটার সঙ্গে আপনাদের পরিবারের সম্পর্ক আছে?"

"নাহ্।" ম্যাডানসায়েব চাপাগলায় বললেন, "বলিনি। তার কারণ পিগার্ড তা হলে বেশি কমিশন দাবি করতেন।"

"আপনার বাড়িতে আর কে আছেন?"

"আমার মেয়ে খুরশিদ আর জামাই কুসরো। আমার স্ত্রী পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন।"

"আর কেউ আছেন?"

"আয়া, খানসামা, বাবুর্চি, আমার ড্রাইভার, দারোয়ান—এরা আছে। কিন্তু পবিত্র হিরের ব্যাপারটা তাদের জানার কথা নয়।"

"আপনার মেয়ে-জামাইয়ের?"

"তারা জানত।"

"আপনার জামাই কী করেন?"

"আমার দোকানের দায়িত্ব তারই হাতে।"

"কলকাতায় আপনার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় আছেন?"

"অবশ্যই আছেন।"

হালদারমশাই ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন, "ইয়োর ডটার বাই সিলিপ্ অব টাং—"

ম্যাডান রুষ্টভাবে বললেন, "নো!"

হালদারমশাই দমে গিয়ে আবার ফেলে আসা নস্যির কৌটো খুঁজতে থাকলেন। কর্নেল বললেন, 'যাই হোক। সম্রাট ইয়াজদার্গিদের হিরে যে আপনার বাড়িতে আছে এবং কোথায় লুকানো আছে, সে-কথা কেউ জানতে পেরেছিল। সে যদি সত্যি লেসার রশ্মি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, সে একজন বিজ্ঞানী। কারণ এখনও বিজ্ঞানী ছাড়া লেসার রশ্মি ব্যবহার কেউ করতে জানে না। করার ঝুঁকি সাঙ্ঘাতিক।"

"পুলিশও তাই বলছে।" বলে ম্যাডানসায়েব কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা ব্যাঙ্কের চেকবই বের করলেন। "ফি-বাবদ আপনাকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে চাই কর্নেল সরকার। আমি আজ বিকেলের প্লেনে ক'দিনের জন্য বাইরে যাব। দরকার হলে আমার বাড়ি বা দোকানে টেলিফোনে

কুসরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাকেও বলে যাব আপনার কথা।"

ম্যাডান চেকবই খুললে কর্নেল বললেম, "দুঃখিত মিঃ ম্যাডান। আমি ফি নিই না।"

"সে কি! এই কেসে আপনাকে—"

"মিঃ ম্যাডান, আমি ডিটেকটিভ নই।" বলে কর্নেল হালদারমশাইকে দেখিয়ে দিলেন। "উনি ডিটেকটিভ। কী হালদারমশাই, কেস নেবেন নাকি?"

হালদারমশাই হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলেন। ম্যাডান বললেন, "কর্নেল-সায়েব! আমি কিন্তু আপনার কাছেই এসেছি। দয়া করে আপনি কেসটা নিন। আমার বিশ্বাস, আপনিই পবিত্র হিরে উদ্ধার করে দিতে পারবেন।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। কোনও কথা বললেন না।

ম্যাডানসায়েব দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "দয়া করে যদি আমার সঙ্গে আসেন, আমার বাড়ির গোপন বেসমেন্ট এবং ভল্ট দেখাতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার দেখা দরকার।"

কর্নেল বললেন, "আপতাত দরকার দেখছি না।"

"তা হলে আপনি কেস নিচ্ছেন না?"

"আপনি কবে ফিরছেন বাইরে থেকে?"

"আগামী রবিবার।"

"ফিরে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

ম্যাডানসায়েব গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। "ক্যাসটা লইলেন না কর্নেলসার? প্রচুর রহস্য! প্রচুর।"

"তার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক রহস্যের খবর আপনি এনেছেন।" বলে কর্নেল টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে লাগলেন। একটু পরে কাকে বললেন, সোমা নাকি? আমি কর্নেল—না! না! শোনো! গত রাত্রে যশোর রোডে একটা অ্যাকসিডেন্ট—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ইন্টারেস্টেড। পরিচয় পাওয়া গেছে? এক সেকেন্ড। লিখে নিচ্ছি।" কর্নেল টেবিলে রাখা প্যাড টেনে কী সব লিখে নিলেন। চাপা দুর্বোধ্য কিছু কথাবার্তাও বললেন।

হালদারমশাই বললেন, "কী? কী?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "ম্যাডানসায়েবের হঠাৎ এতদিন পরে আমার কাছে আসার কারণ খুঁজছিলাম, হালদারমশাই! আমার যখনই সন্দেহ হয়, কেউ কোনও তথ্য গোপন করে আমার সাহায্য চাইছে, তখন তার কেস নেওয়া

আমি পছন্দ করি না। গত রাত্রে আপনার দেখা ভুতটা যাকে আছাড়ে মেরেছে, তার নাম জামসিদ নওরোজি।"

চমকে উঠে বললাম, "পারসি নাম!"

"হ্যাঁ। তার চেয়ে বড় কথা, ভদ্রলোকের একটা কিউরিও শপ আছে। প্রত্নদ্রব্যের দোকান।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "আবার তাঁর দোকানটাও ম্যাডান জুয়েলার্সের ওপরতলায়। কাজেই চলুন হালদারমশাই, সেই ভূতের আখড়াটি দেখে আসা যাক। জয়ন্ত! তুমিও চলো তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য কয়েক কিস্তি লোভনীয় খাদ্য পেয়ে যাবে।"

। ২ ।

প্রথমে চোখে পড়ল জংধরা ছোট্ট গেটের পাশে সাঁটা একটুকরো চৌকো ফলক। তাতে ইংরেজিতে লেখা আছেঃ Human Genome Research Centre.'

দোতলা বাড়িটা সত্যিই হানাবাড়ি। গেটে তালা বন্ধ। ভেতরে আগাছার জঙ্গল। চারদিকে দেওয়ালঘেরা এই বাড়ীর অবস্থাও জরাজীর্ণ। পলস্তারা খসে গেছে কোথাও-কোথাও। কার্নিসে গাছ গজিয়ে আছে। পুরনো আমলের বাগানবাড়ি হতে পারে। ডাইনে বিশাল এলাকা জুড়ে কী কারখানা গড়া হচ্ছে। বাঁ দিকে একফালি খোয়াবিছানো রাস্তা এবং নতুন-পুরনোয় ঘেঁষাঘেঁষি অনেক বাড়ি। একটাতে ঘন গাছপালা। হঠাৎ করে মনে হয় গ্রাম-শহরে মেশানো কোনও মফস্বল জনপদ।

কর্নেল বাইনোকুলারে গেট থেকে ভেতরটা দেখছিলেন। বললাম, "এ কিসের গবেষণাকেন্দ্র?"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "জেনেটিক্সের।"

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন, "কী? কী"

জবাব না দিয়ে কর্নেল ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেলেন একটা পান-সিগারেটের দোকানের দিকে। হালদারমশাই আমার দিকে তাকালেন। বললাম, "জেনেটিক্ ব্যাপারটা আমিও বুঝি না হালদারমশাই। শুধু এটুকু বলতে পারি, এখানে সম্ভবত কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র গড়া হবে। তাই আগেভাগেই ফলক সেঁটে দিয়েছে।"

"গভমেন্টের কারবার! দেখি, নস্য পাই নাকি।" বলে হালদারমশাইও সেই দোকানটার দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন।

আমি আমার ক্রিমরঙা মারুতি গাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। এভাবে একানড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। পড়েছি দু-দু'জন ছিটগ্রস্তের পাল্লায়।

বরাতে কী আছে কে জানে। বসে থাকতে-থাকতে গেটের ভেতর দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালাম। সেইসময় হঠাৎ দোতলার একটা জানালা খুলে গেল এবং একটা মুখ দেখলাম।

নাহ্। ভূতের মুখ বলে মনে হল না। গোলগাল অমায়িক এবং বেশ সভ্যভব্য মানুষের মুখ। আপনমনে হাসছেন তিনি। উৎসাহে গাড়ি থেকে নেমে ওঁকে ডাকব ভাবছি, হঠাৎ জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। তা হলে বাড়িটাতে এখন কেউ আছেন। কিন্তু বাইরের থেকে গেটে তালা কেন? খটকা লাগল।

কর্নেল এবং হালদারমশাই ফিরে এলে কথাটা বললাম। কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ, তুমি বসন্তবাবুকে দেখেছ। শুনলাম ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল। তাই ওঁর ছোটভাই রাজেনবাবু ওঁকে বাড়িতে আটকে রেখে বাইরে যান। রাজেন অধিকারী নাকি বাঙ্গালোর কী চাকরি করতেন। সম্প্রতি এই পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছেন।"

হালদারমশাই ততক্ষণে গেটের কাছে হেঁড়ে গলায় ডাকাডাকি শুরু করেছেন, "বসন্তবাবু! বসন্তবাবু! মিঃ অধিকারী।"

কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই। বসন্তবাবুকে ডেকে লাভ নেই। তা ছাড়া পাগলের পাল্লায় পড়া কাজের কথা নয়। আসুন আমরা একবার এক-জায়গায় যাব।"

হালদারমশাই চাপা গলায় বললেন, "কর্নেলসাব, এই চান্স। ছাড়া ঠিক নয়। কাল রাত্তিরে যা স্বচক্ষে দেখেছি, তার তদন্ত করা দরকার।"

"আপনি তা হলে তদন্ত করুন। আমরা চলি।"

হালদারমশাই কান করলেন না। গেটের গ্রিলের খাঁজে পা রেখে উঠে গেট পেরিয়ে গেলেন। বললাম, "সর্বনাশ। হালদারমশাই করছেন কী।"

কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন, "ওঁর কাজ উনি করুন। গাড়ি ঘোরাও। আমরা এবার যাব চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি।"

"বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত?"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ ডার্লিং। এই হিউম্যান জেনোম ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আমাদের অনেক বছরের পরিচয়। উনি থাকেন এখান থেকে এক কিমি উত্তরে একটা প্রত্যন্ত এলাকায়। সদর রাস্তা থেকে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকে আরও জঙ্গুলে এলাকায় ওঁর ডেরা। নিরিবিলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত জায়গা। ওঁর একটি রোবট আছে। তার নাম 'ধুন্ধুমার'। ডাকনাম 'ধুন্ধু'। এই বিকট নামের কারণ আছে। শব্দটি উচ্চারণ করলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তা রোবটটিকে নাকি সক্রিয় করে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মনুষ্যাকৃতি রোবটটিকে সোনিক রোবট বলা চলে।

তবে ধুন্ধুকে আমার বড্ড ভয় করে। যন্ত্রমানুষ আর পোষা বাঘ প্রায় একই জিনিস।

গাড়ির হর্ন দিতেই অটোমেটিক গেট খুলে গেল। বিজ্ঞানী প্রবরকে সহাস্যে এগিয়ে আসতে দেখলাম। চিবুকে তেকোনা দাড়ি, একরাশ আইনস্টাইনি চুল। বেঁটেখাটো মানুষটি বড়ই সদালাপী। কর্নেল এবং আমার সঙ্গে কড়া হ্যান্ডশেক করে ড্রইংরুমে ঢোকালেন। ধুন্ধুকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আরও নিশ্চিন্ত হলাম শুনে যে, ধুন্ধুর কী ভাইরাসঘটিত অসুখ হয়েছে। ল্যাবে তার চিকিৎসা চলছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আজকাল আর সিন্থেটিক কফি খাই না। ন্যাচারাল কফি খাওয়াচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "কফি পরে হবে। আগে কাজের কথা সেরে নিই।"

"বলুন! এ বেলা আমার হাতে অঢেল সময়।"

"হিউম্যান জেনোম সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।"

বিজ্ঞানী ভুরু কুঁচকে তাকালেন। "জেনোম? আপনি কি জেমস ডি ওয়াটসনের তত্ত্বের কথা বলেছেন? নোবেল-লরিয়েট ওয়াটসন?"

"হ্যাঁ। ওঁর হিউম্যান জেনোম প্রজেক্টের কথা শুনেছি।"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "আমি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের কারবারি। তবে ইদানীং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমার লাইন জেনেটিক্সের কাছাকাছি এসে পড়ছে। তো জেনোম প্রজেক্ট! মানুষের প্রতি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম আছে। ক্রোমোসোমের মধ্যে আছে মালার মতো সাজানো অসংখ্য জিন। সঠিক হিসাব এখনও করা যায়নি। ওয়াটসনের মতে, একজন মানুষের দেহে ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ জিন আছে। প্রতিটি জিনে আছে তিনশো কোটি ডি এন এ। এই ডি এন এ-র মধ্যে সঙ্কেতে লুকনো আছে মানুষের বংশগত বহু লক্ষণ বা চরিত্র। ওয়াটসন ডি এন এ-র গঠন খুঁজে সেই সঙ্কেতগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। সেটাই ওঁর জেনোম প্রকল্প।"

"জেনোমতত্ত্ব কেউ কি এ-পর্যন্ত বাস্তবে কাজে লাগাতে পেরেছেন?"

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ্। স্রেফ তত্ত্ব। তবে স্বয়ং ওয়াটসনেরই মতে, একে কাজে লাগিয়ে বড়জোর বংশানুক্রমিক আদিব্যাধি নির্মূল করা যায়। এই পর্যন্তই।"

"এর অপব্যবহার করা কি সম্ভব?"

"বাস্তবে কাজে লাগাতে পারলে অপব্যবহার সম্ভব বই কী।"

"কী ধরনের অপব্যবহার?"

চন্দ্রকান্ত খিক-খিক করে খুব হাসলেন। "সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করা যায়। শরীরের গড়ন বদলে দেওয়া যায়। তবে তার জন্য জেনোমের দরকার কী?

সেটা স্রেফ কিছু খাইয়ে বা অপারেশন করেও করা যায়! মোট কথা, তত্ত্বটা এখনও নিছক তত্ত্বই।

"এ-শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটেন-আমেরিকায় জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য জেনেটিক্সের 'ইউজেনিক' তত্ত্ব নিয়ে খুব হইচই বেঁধেছিল। নাৎসি জার্মানিতে ইউজেনিক তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ ইহুদি-হত্যার কারণ হয়েছিল। বিজ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানীরা সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক। ইদানিং দেখছি, জেনেটিক্সের নানা তত্ত্বের উদ্ভট-উদ্ভট ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে।"

কর্নেল চুরুট জেবলে বললেন, "জেনোম প্রকল্পের সাহায্যে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করা সম্ভব?"

চন্দ্রকান্ত আবার ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর ফিক করে হাসলেন। "বহুবছর আগে নোবেলজয়ী আণবিক জীববিজ্ঞানী জাক মোদে বলেছিলেন, ল্যাবে মানুষ গড়ে ফেলবেন। ফুঃ! মানুষ ইজ মানুষ।"

"কৃত্রিম ডি এন এ অণু তৈরি কি সম্ভব?"

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বললেন, "আপনার পয়েন্টটা কী?"

"এই এলাকায় একটি হিউম্যান জেনোম রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে বা হবে জানেন?"

চন্দ্রকান্ত ভুঁড়ি নাচিয়ে আর-এক দফা হাসলেন। "আপনি নিশ্চয় রাজেন অধিকারীর কথা বলছেন? আমেরিকার কোনও ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিক্স বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন ভদ্রলোক। শুনেছি মাত্র। আলাপ হয়নি। এ-ও শুনেছি, ভালমানুষ দাদার ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তাঁকে পাগল করে ফেলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

কর্নেল আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, "আমি আপনার সাহায্য চাই চন্দ্রকান্তবাবু!"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চিবুকের তেকোনা দাড়ি চুলকোচ্ছিলেন। এটা ওঁর চিন্তাভাবনার লক্ষণ। একটু পরে বললেন, "হালদারমশাইয়ের দেখা প্রথম ঘটনাটা, মানে পারসি ভদ্রলোককে তুলে আছাড় মারাটা চিন্তাযোগ্য বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা ওঁর দেখার ভুল হতেও পারে। মানে, চোখ উপড়ে বেসিনে ধোওয়া এবং রক্ত! তারপর সেই চোখ থেকে গুলি বের করা। হালদার-মশাইকে তো বিলক্ষণ জানি!"

বলে চন্দ্রকান্ত হেসে উঠলেন। বললাম, "গুলির শব্দ শুনেছিলেন হালদারমশাই! ঘটনাস্থলে পাওয়া রিভলভারটা তার প্রমাণ।"

"গুলিটা নকল পাথুরে চোখে লেগেছিল।" চন্দ্রকান্ত আবার দাড়ি চুলকোতে থাকলেন। "যাই হোক, লোকটার গায়ের জোরই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। কোনও কথা বললেন না। আমি বললাম, "আপনি বিজ্ঞানী। এ-যুগে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-কাহিনী কি বাস্তবে সম্ভব নয়? আপনিই বললেন, জেনোমতত্ত্ব কাজে লাগিয়ে শরীরের গড়ন বদলানো যায়। শারীরিক শক্তিও তা হলে বদলানো যায়?"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "তা যায়। তবে—"

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, "আপনার ধুন্ধুমার যন্ত্রমানুষ মাত্র। কিন্তু কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম পেশি-শিরা-উপশিরা, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস এবং কৃত্রিম রক্ত তো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এ-যুগে। বাকি রইল কৃত্রিম মগজ। কোনও বিজ্ঞানী কি এইসব জুড়ে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করতে পারেন না?"

"পারেন, স্বীকার করছি। কিন্তু সেই কৃত্রিম মানুষও আসলে রোবট ছাড়া কিছু নয়। কারণ, তার কৃত্রিম মগজ মানুষের মগজের মতো স্বাধীন চিন্তা করতে পারবে না। যে তাকে তৈরি করেছে, তারই চিন্তাভাবনা বা ইচ্ছা তাকে কন্ট্রোল করবে।"

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। "তা হলে তাকে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে চালানো যাবে।"

"ঠিক। একশোভাগ ঠিক।" চন্দ্রকান্ত চাপাস্বরে বললেন, "এখন কথা হচ্ছে, রাজেন অধিকারী তা করতে পেরেছেন কি না।"

আমি না বলে পারলাম না, "ম্যাডানসায়েবের হিরে চুরি তা হলে রাজেন-বাবুরই কীর্তি। জেনোম রিসার্চের জন্য প্রচুর টাকার দরকার। হিরেটার দাম এ-বাজারে প্রায় দেড় কোটি টাকা।"

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "জয়ন্ত খাঁটি সাংবাদিক হতে পারল না বলে ওর সমালোচনা করি বটে, তবে ওর মধ্যে সাংবাদিক সুলভ চটজলদি সিদ্ধান্ত করার স্বভাব আছে। ডার্লিং! তোমাকে বারবার বলেছি, বাইরে থেকে যা যেমনটি দেখাচ্ছে, ভেতরে তা তেমনটি নয়।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন না, রাজেন অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করে আসি। যদি উনি এতক্ষণ না ফিরে থাকেন, আমি এম পি ডি দিয়ে বাইরে থেকে কিছু ডেটা সংগ্রহ করে নেব।"

বললাম, "এম পি ডি মানে?"

"মাল্টিপারপাস ডিটেক্টর। আমারই আবিষ্কার।" চন্দ্রকান্ত সগর্বে বললেন। ওঁর বাড়ির ভেতর কী কাজকর্ম হয়, তার হদিস পেয়ে যাব।"

কর্নেলও উঠলেন। বললেন, "আমার ভয় হচ্ছে, হালদারমশাই কোনও কেলেঙ্কারি না বাঁধান। একগুঁয়ে মানুষ। আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড। আবার ওই জিনিষটাই তাঁকে বিপদে ফেলে। অন্তত তাঁর অবস্থা জানার জন্যও আমাদের

ওখানে আবার যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে।"

বিজ্ঞানী নিজের গাড়ী বের করলেন। ওঁর গাড়ি আগে, আমাদেরটা পেছনে। বিজ্ঞানীর গাড়ি বলে কথা! সদর রাস্তায় পৌঁছে রকেটের বেগে উধাও হয়ে গেল। বললাম, "কী অদ্ভুত মানুষ!"

কর্নেল হেসে বললেন, "সম্ভবত আমরা আরও অদ্ভুত মানুষের পাল্লায় পড়তে চলেছি ডার্লিং।"

"আপনি কি কৃত্রিম মানুষের কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন—মানে যাকে গত রাতে হালদারমশাই দেখেছেন?"

"নিছক একটা থিওরি, জয়ন্ত।" বলে কর্নেল বাইনোকুলার তুলে রাস্তার ধারের গাছে হয়তো পাখি খুঁজতে থাকলেন।

সেই বাড়িটার কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম। বিজ্ঞানীপ্রবরের গাড়িটা খুঁজে পেলাম না। বললাম, "সর্বনাশ। চন্দ্রকান্তবাবুকে কৃত্রিম মানুষ হাপিজ করে দেয়নি তো?"

কর্নেল গাড়ি থেকে বেরিয়ে বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবুর অভ্যাস খোদার ওপর খোদকারী করা। ন্যাচারাল কফির বদলে সিন্থেটিক কফি খান। খিদে পেলে নাকি এনার্জি ক্যাপসুল খান। কৃত্রিম অর্থাৎ ওঁর ভাষায় সিন্থেটিক মানুষের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যাই হোক, গেটের দরজায় আর তালা আঁটা নেই। হুঁ, ওই দ্যাখো ওঁর গাড়ি!"

বলে কর্নেল গেট ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে গেলেন! আমি গাড়ি ঢোকাতে সাহস পেলাম না। বেরিয়ে গিয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।

এবড়োখেবড়ো খোয়া-ঢাকা রাস্তা। দু'ধারে বিচ্ছিরি জঙ্গল। বাড়িটার সামনে চন্দ্রকান্তের গাড়ি দাঁড় করানো। আমরা সেখানে যেতেই তাঁর সাড়া পাওয়া গেল ঘরের ভেতর থেকে। "চলে আসুন কর্নেল!"

সেকেলে হলঘর বললেই চলে। ঝাড়বাতিও আছে। পুরনো আসবাবপত্রে সাজানো বনেদি পরিবারের বৈঠকখানা। চন্দ্রকান্ত আলাপ করিয়ে দিলেন রাজেন অধিকারীর সঙ্গে। রাজেনবাবুর বয়স আন্দাজ ষাটের কাছাকাছি। রোগা হাড়গিলে চেহারা। পরনে গলাবন্ধ কোট আর ঢোলা প্যাতলুন। মাথায় কাঁচাপাকা সন্ন্যেসিচুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। কেমন ভুতুড়ে চেহারা যেন।

তবে হাসিটি অমায়িক এবং হাবভাবেও বড় বিনয়ী। শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করে আমাদের বসালেন। বললেন, "হিউম্যান জেনোম রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে ক্রমশ আপনাদের মতো বিশিষ্ট মানুষদের আগ্রহ জাগাতে পেরেছি, এ আমার সৌভাগ্য। দেশে ফিরে আসার পর বিজ্ঞানী মহলে শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। এখন দেখছি, সমঝদার বিজ্ঞ মানুষেরও অভাব নেই।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিঃ পদার্থবিদ মিঃ চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকেও আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি।"

চন্দ্রকান্ত সহাস্যে বললেন, "এবং একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীকেও! উনি কর্নেলের দিকে আঙুল তুললেন।

কর্নেল বললেন, "এবং একজন নামকরা সাংবাদিককেও!" কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। ঠোঁটের কোনায় দুষ্টু হাসি।

রাজেনবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু! আমার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু লিখুন। এদেশে এই প্রথম বেসরকারী উদ্যোগে জেনোম প্রজেক্ট। গভর্নমেন্ট মানেই আমলাতন্ত্র। কিন্তু সরকারী বিজ্ঞানীদের আমলাতন্ত্র আরও সাঙ্ঘাতিক। বলে, টাকা দিচ্ছি। তবে বোর্ড গড়তে হবে। তাতে ওঁরা থাকবেন। বুঝুন ব্যাপার! লাল ফিতের ফাঁসে দম আটকে শেষে আমিই মারা পড়ব।"

কর্নেল বললেন, "আপনার ল্যাব আছে নিশ্চয়?"

"আছে—মানে, সবে গড়তে শুরু করেছি।"

"জয়ন্তকে আপনার ল্যাব দেখিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন। তা হলে ও সেইভাবে কাগজে লিখবে। আর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লেখা মানেই প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি।"

"জানি, জানি।" বলে উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন রাজেন অধিকারী। "আসুন আপনারাও আসুন!"

ল্যাবরেটরী মানেই বিদঘুটে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক জিনিসপত্র, নানারকম গন্ধ। তার সঙ্গে একালে হরেক সাইজের কম্পিউটার এবং ভিশনস্ক্রিন যুক্ত হয়েছে। তা চন্দ্রকান্তের ল্যাব এবং রাজেনবাবুর ল্যাবের মধ্যে একটাই ফারাক চোখে পড়ল। জারে রঙিন তরল পদার্থে চুবানো ইঁদুর, আরশোলা টিকটিকি ইত্যাদ সরীসৃপ-পোকামাকড়। তারপর আঁতকে উঠলাম দেখে, কবজি থেকে কাটা একটা হাত। মানুষের হাত। আমার চমক লক্ষ্য করে রাজেনবাবু বললেন, "হাসপাতালের মর্গ থেকে জোগাড় করেছি। এবার জেনোম ব্যাপার বুঝিয়ে বলি।"

আমার পকেটে রিপোর্টারস নোটবই সবসময় থাকে। উনি বকবক শুরু করলে আমি নোট নেওয়ার ভান করে যা খুশি লিখতে থাকলাম। চন্দ্রকান্ত একটা কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে আছেন দেখলাম। কিন্তু কর্নেল কোথায় গেলেন?

প্রায় আধ ঘণ্টা টানা বকবক করে এবং এটা-ওটা দেখিয়ে রাজেন অধিকারী যখন থামলেন, তখন আড়চোখে তাকিয়ে কর্নেলকে ঢুকতে দেখলাম।

একটু পরে আমাদের বিদায় দিতে গেট পর্যন্ত এলেন রাজেন অধিকারী বললেন, "আপনাদের জন্য সব সময় দরজা খোলা।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত কেন কে জানে, একটি কথাও না বলে তাঁর গাড়ি নিয়ে আগের মতোই উধাও হয়ে গেলেন। আমরা এগোলাম ভি আই পি রোডের দিকে। যেতে-যেতে বললাম, "গোপন তদন্তের ফল বলতে আপত্তি আছে?"

কর্নেল হাসলেন, "বন্দি হালদারমশাইকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তিনি ভোঁ-কাট করেছেন।"

চমকে উঠে বললাম, "অ্যাঁ?"

কর্নেল শুধু বললেন, "হ্যাঁ।"

॥ ৩ ॥

কোনও গুরুতর চিন্তাভাবনার সময় আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির চোখ বুজে যায়। ডাকলেও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা তখনকার মতো জানা গেল না। শুধু ভাবছিলাম, জারে চুবানো সেই কাটা হাতটার কথা এবং শিউরে উঠছিলাম। হালদারমশাই জোর বাঁচা বেঁচেছেন তা হলে। আমরা পৌঁছতে দেরি করলে গোয়েন্দা ভদ্রলোককে নিশ্চয় কুচিকুচি করে কেটে 'জেনোমবিজ্ঞানী' রাজেন অধিকারী জারে চুবিয়ে রাখতেন।

"কর্নেলের বাড়ির লনে গাড়ি ঢুকিয়ে দেখি, উনি তখনও ধ্যানস্থ। বললাম, "এসে গেছি বস্।"

কর্নেল চোখ খুলে বললেন. "কখনও কানমলা খেয়েছ, ডার্লিং?"

হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, "কানমলা? তার মানে?"

"নিশ্চয় খেয়েছ। বিশেষ করে তোমার ছেলেবেলা পাড়াগাঁয়ে কেটেছে যখন।" কর্নেল আস্তে-সুস্থে গাড়ি থেকে বেরোলেন। একটু হেসে বললেন, "কানমলা খাওয়া খুব অপমানজনক ব্যাপার। কাউকে চূড়ান্ত অপমান করতে হলে কানমলে দেওয়াই যথেষ্ট। কারও কান ধরলেই সে জব্দ হয়। শুধু মানুষ নয় জয়ন্ত! জন্তু-জানোয়ারও কান ধরলে জব্দ।"

"ব্যাপারটা কী?"

"তুমি কি গাড়িতেই বসে থাকবে, না কি বেরোবে?"

ঘড়ি দেখে বললাম, "বারোটা বাজে। প্রেস ক্লাবে লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে। এক মন্ত্রী ভাষণ দিতে আসবেন।"

"ঠিক আছে। তা হলে তুমি এসো।" বলে কর্নেল চলে গেলেন।

একটু অভিমান নিশ্চয় হল। হালদারমশাইয়ের "বন্দি হওয়া" এবং 'কানমলা' ব্যাপারটা জানার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই খেয়ালি বৃদ্ধের রকমসকম বরাবর

দেখে আসছি। যথাসময়ে নিজে থেকেই জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কাজেই গাড়ি ঘুরিয়েই তখনই স্থানত্যাগ করলাম।

সন্ধের দিকে একবার ভেবেছিলাম কর্নেলের বাড়ি যাব! কিন্তু উনি যখন-তখন হুট করে বেরিয়ে নিপাত্তা হয়ে যান। তাই টেলিফোন করলাম। ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। এককথায় জানিয়ে দিল, "বাবামশাই বেইরেছেন।"

হালদারমশাইয়ের ফ্ল্যাটে রিং করলাম। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে রিং করলাম। ফোনে তখনই সাড়া এল, "জয়ন্তবাবু নাকি?"

অবাক হয়ে বললাম, "গলা শুনেই লোক চেনার যন্ত্র তৈরি করেছেন বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠিক তা-ই।" বিজ্ঞানীর হাসি ভেসে এল। "আমার সোনিম থিওরি⋯"

ঝটপট বললাম, "জেনোম থিওরির পর সোনিম থিওরি এলে আমার বারোটা বেজে যাবে চন্দ্রকান্তবাবু! প্লিজ! থিওরি থাক।"

"সহজ ব্যাপার জয়ন্তবাবু! ইংরেজিতে এস ও এন আই এম সোনিম। শব্দ! ধ্বনি! বুঝলেন তো?"

"চন্দ্রকান্তবাবু—"

"ল্যাবে বসে আছি, জয়ন্তবাবু! আমার ঘরে যাঁরা আসেন, তাঁদের গলার স্বর, শব্দ উচ্চারণের বিশেষ-বিশেষ ভঙ্গি ইত্যাদি সব রেকর্ড করে রাখি। কম্পিউটারে সেই ডেটা অ্যানালিসিস করে নিই। তারপর টেলিফোনের সঙ্গে কম্পিউটারের কানেকশন! ব্যস! সো ইজি।"

"প্লিজ! আমি জানতে চাইছি আপনার সেই মাল্টিপারপাস ডিটেক্টর যন্ত্রে রাজেনবাবুর বাড়ি সম্পর্কে কী তথ্য পেলেন?"

"ডেটা অ্যানালিসিস চলছে। এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। আরও দু-একটা দিন লেগে যাবে হয়তো।"

"কৃত্রিম মানুষের কোনও হদিস পেলেন কি?"

"নাহ্। তবে একটা অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ ধরা পড়েছে। কোনও পার্থিব বস্তু বা প্রাণী এই ধ্বনিতরঙ্গের কারণ নয়, এটুকু বলতে পারি।"

"চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি তো হালদারমশাইকে ভালই চেনেন।"

"খুউব চিনি।"

"রাজেনবাবুর বাড়ি ঢুকে উনি বিপদে পড়েছিলেন। আমরা যখন ওঁর ল্যাবে ছিলাম, তখন কর্নেল ওঁকে দেখতে পান। বন্দি অবস্থায় ছিলেন। কর্নেল ওঁকে উদ্ধার করেন।"

"হাঃ হাঃ হাঃ! কর্নেল আমার পাশেই বসে আছেন। কথা বলুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "ডার্লিং! তখন যে কথাটা তোমাকে

বোঝাতে চেয়েছিলাম, আবার বুঝতে চেষ্টা করো। কানমলা! প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হলে তার কান ধরে ফেলবে। কেমন? যখনই কেউ তোমার ওপর হামলা করবে, তোমার লক্ষ্য হবে তার কান। ভুলো না কিন্তু।"

চটে গিয়ে বললাম, "এই নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করছি—"

"নাক নয়, কান। তুমি কানমলে প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারটা লক্ষ্য করো, জয়ন্ত। তা হলেই বুঝতে পারবে, কান একটা ভাইটাল প্রত্যঙ্গ। মানুষ শুধু নাকমলে প্রতিজ্ঞা করে না, কানও মলতে হয়। তবে নাহ্। নিজের কান নিজে মলে নিজেকে জব্দ করার অর্থ হয় না।"

"ছাড়ছি।"

"কান ধরে আছ নাকি?"

"নাহ্। ফোন।"

"ফোনের সঙ্গে কানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ডার্লিং! ফোন মানে ধ্বনি। ধ্বনি আমরা কান দিয়েই শুনি।"

খাপ্পা হয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ঠিক করলাম, এসব উদ্ভুট্টে ব্যাপারে কিছুতেই নাক গলাব না। এমনকী, ওই 'বৃদ্ধ ঘুঘু'র মুখদর্শনও আর করব না।

পরদিন বিকেলে পত্রিকা-অফিসে রাজেন অধিকারীর টেলিফোন পেলাম। রাজেনবাবু বললেন, "মিঃ জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"জয়ন্ত চৌধুরী বলছি।"

"মিঃ চৌধুরী! খবরটা তো বেরোল না আপনাদের কাগজে? খুব আশা করে ছিলাম।"

"বেরোবে। আসলে আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের চাপ খুব বেশি তো! সবসময় সব খবরকে জায়গা দেওয়া যায় না।"

"শুনুন! ব্যাপারটা সায়েন্টিফিক কিনা! কাজেই জটিল। আপনার লেখার সুবিধে হবে বলে আমি একটা আর্টিক্ল্-আকারে লিখে লোক দিয়ে পাঠাব কি?"

"পাঠাতে পারেন। কিন্তু এখনই আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতে হবে। ফিরতে দেরি হতে পারে। নীচের রিসেপশনে দিয়ে যেতে বলবেন আপনার লোককে।"

"না জয়ন্তবাবু! ওটা আপনার হাতেই সরাসরি পৌঁছনো দরকার। কারণ এর আগে আমি সব কাগজে রাইট-আপ পাঠিয়েছি। ছাপা হয়নি। প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি। কেউ আসেনি। আমাকে আসলে কেউ পাত্তা দিতে চায় না। হ্যাঁ, ছোটখাটো কাগজ ছেপেছে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। হয় না। বড় কাগজে বেরোলে লক্ষ লক্ষ লোকের নজরে পড়ে।"

"বুঝেছি। আপনি এক কাজ করুন। খামে আমার নাম লিখে পাঠান। তা হলেই আমি পেয়ে যাব।"

"ঠিক আছে। আসলে আমি আজই ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তাই এত তাড়া।"

"এক মিনিট মিঃ অধিকারী! কাল সকালে কি আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল? হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!"

একটু পরে সাড়া এল। "ঢুকেছিল। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"রিপোর্টারদের খবরের সোর্স বলা বারণ। হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!"

লাইন কেটে গেল। বুঝলাম, বোকামি করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাইকে ফোন করলাম। রিং হতে থাকল। কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। টেলিফোনের গণ্ডগোল অথবা হালদারমশাই কোথাও পাড়ি জমিয়েছেন। ভদ্রলোক রহস্য-অন্ত-প্রাণ যাকে বলে। হয়তো ইয়াজদাগির্দের হিরের খোঁজেই হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাত দশটায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম প্রতিদিনের মতো। রাজেন অধিকারীর কোনও রাইট-আপ বা আর্টিক্‌ল কেউ রিসেপশনে জমা দিয়ে যায়নি। সত্যি, মুখ ফসকে কথাটা বলা বোকামি হয়েছে। লোকটা সতর্ক হয়ে গেছে।

সল্ট লেকে নতুন কেনা ফ্ল্যাটে মাসখানেক হল উঠেছি। রাস্তা খাঁ-খাঁ জনহীন। শীতের রাতে কুয়াশা জমে আছে গাছপালায়। হঠাৎ দেখি প্রায় তিরিশ মিটার দূরে একটা লোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছে। হর্ন দিয়েও তাকে সরনো গেল না। পাগল-টাগল হবে। তাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আবার সামনে এসে দাঁড়াল। দুটো ল্যাম্পপোস্টের মধ্যবর্তী জায়গা। দু'ধারে গাছ এবং ঝোপঝাড়। ব্রেক কষেই দেখি তার গায়ে নেভিব্লু সোয়েটার।

তারপর তার চেহারার দিকে চোখ গেল। ও কি মানুষ? ও কী মানুষ?

হালদারমশাইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে আমার গাড়ির সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, গাড়িটা সে দুহাতে উলটে ফেলে দেওয়ার মতলব করছে।

এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অমনই সে আমার দিকে এগিয়ে এল। অদ্ভুত জ্বলজ্বলে নীলচে চোখে হিংস্রতার ছাপ।

মুহূর্তে কর্নেলের কথাটা মনে পড়ে গেল। আমাকে ধরার আগেই মরিয়া হয়ে আমি তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে তার কান দুটো ধরে মোচড় দিলাম। অমনই সে ধড়াস করে নেতিয়ে পড়ল। একেবারে চিৎপাত।

এর পর আর নার্ভ ঠিক রইল না আমার। সটান গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

ফ্ল্যাটে ফিরে প্রতিজ্ঞা ভুলে কর্নেলকে রিং করলাম। আমার হাত তখনও কাঁপছিল। কর্নেলের সাড়া পেয়েই বললাম, "এইমাত্র দারোয়ানটার পাল্লায় পড়েছিলাম। আপনার কথামতো—"

"কানমলে জব্দ করেছ তো?"

"হ্যাঁ। সাংঘাতিক ব্যাপার। ভাগ্যিস আপনার পরামর্শটা মনে পড়েছিল। নইলে জামসিদ নওরোজির মতো হাড়গোড়-ভাঙা দলাপাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে থাকতাম। শীতের রাতে সল্ট লেকের ব্যাপার তো জানেন। চেঁচিয়ে মাথা ভাঙলেও কেউ বেরিয়ে আসত না।"

কর্নেলের হাসি শোনা গেল। বললেন, "ডার্লিং! তোমার ওপর তো রাজেনবাবুর রাগ হওয়ার কথা নয়। উনি কাগজে প্রচার চান।"

"আমারই বোকামি। উনি বিকেলে ফোন করেছিলেন।" বলে ঘটনাটা সবিস্তার জানিয়ে দিলাম।

কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বরাবরই বন্দী হন, সে তো জানো! এবারও মুখে টেপ-সাঁটা অবস্থায় বাথরুমে বন্দী ছিলেন। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা ছিল। দরজায় পাহারা দিচ্ছিল তোমার দেখা দানো আমার ভাষায় কৃত্রিম মানুষ। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সিন্থেটিক কফির মতো সিন্থেটিক ম্যানও বলতে পারো। তো তার পাল্লায় পড়ে আমারও বাঁচার কথা ছিল না। দৃশ্যটা কল্পনা করো জয়ন্ত! বাথরুম খোলা। হালদারমশাই পড়ে আছেন। দানোটা দরজার সামনে আমাকে দেখেই দু'হাত বাড়াল। জায়গাটা করিডরমতো। কয়েক হাত দূরে দোতলার সিঁড়ি। হঠাৎ দেখি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন এক ভদ্রলোক। মুখে শিশুর হাসি। দেখামাত্র বুঝলাম রাজেনবাবুর দাদা সেই পাগল ভদ্রলোক। মিটিমিটি হেসে চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় বললেন, "কান মলে দিন ব্যাটাচ্ছেলের! জব্দ হবে।" ব্যস! দানোটা হাত বাড়াতেই আমি তার কান দুটো ধরে জোরে মলে দিলাম। কাজেই তোমাকে কান মলে দেওয়ার কথা বলে আসলে সতর্ক করেই দিয়েছিলাম।"

"থ্যাংকস্‌ বস্‌! কিন্তু কালই পুলিশকে জানিয়ে দেননি কেন?"

"হালদারমশাই জানিয়েছিলেন। পুলিশ গিয়ে কোনও হদিস পায়নি। মাঝখান থেকে হালদারমশাই পুলিশের জেরায় জেরবার হয়েছেন।"

"উনি কোথায় আছেন? ফোনে পাচ্ছি না কাল থেকে।

"দমদমে ওঁর সেই আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। আসলে রাজেনবাবুর বাড়ির দিকে সারাক্ষণ নজর রাখার জন্য ওখানে ডেরা পেতেছেন।"

"আমার নার্ভ বিগড়ে গেছে, বস্‌! রাখছি।"

"সকালে চলে এসো। চন্দ্রকান্তবাবুর আসার কথা আছে।"

"যাব।"

ফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। কলকাতা মহানগরে এমন একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক দানো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কি বিশ্বাস করতে চাইবে ?

সারাটা রাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছিলাম। একটু শব্দ হলেই চমকে উঠি। ওই ভয়ঙ্কর দানোকে কোনও অস্ত্রেই জব্দ করা যাবে না। শুধু কান মললেই ব্যাটাচ্ছেলে কাত। কাজেই যদি সে রাতবিরেতে হানা দেয়, তার কান মলে দেওয়ার জন্যই জেগে থাকা দরকার।

শেষ রাতে কখন একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেটা জেগে ওঠার পর বুঝলাম। নিজের ওপর চটে গেলাম। ভাগ্যিস দানোটা ওত পাততে আসেনি।

যখন কর্নেলের তেতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ভাষণ দিচ্ছেন এবং কর্নেল মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ইশারায় আমাকে বসতে বললেন কর্নেল। ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত বলছিলেন, "ক্লোনিং আর জেনোম এক জিনিষ নয়। ক্লোনিং বলতে সাদা বাংলায় কলম করা। হাজার বছর আগেও মানুষ জেনেটিক্স না জেনেও ক্লোনিং করেছে। এক জাতের উদ্ভিদের সঙ্গে আর-এক জাতের উদ্ভিদ কিংবা এক জাতের প্রাণীর সঙ্গে আর এক জাতের প্রাণীর ক্লোনিং করেছে। কিন্তু আধুনিক জেনেটিক্সের থিওরির অপব্যাখ্যা করে কেউ-কেউ বলছেন, দেহকোষের ডি এন এ অণুতে কারচুপি করে মানুষকে গাধা করা যায়। কিংবা ধরুন, একই মানুষের অসংখ্য আদল গড়া যায়। হুবহু তারা এক। এভাবে অসংখ্য কর্নেল কিংবা এই চন্দ্রকান্ত চৌধুরি বাজারে ছাড়া যায়। কিন্তু আমি বলব, এটা বাড়াবাড়ি। এটা স্রেফ গুল। বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান। মশাই, মানুষ ইজ মানুষ! জেনোম থিওরি কখনও দাবি করছে না, মানুষকে গাধা কিংবা দানো বানানো যায়।"

কর্নেল বললেন, "সিন্থেটিক ম্যানের ব্যাপারটা বলুন চন্দ্রকান্তবাবু!"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "রাজেন অধিকারীর বাড়িতে অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ অ্যানালিসিস করে বুঝেছি, আমার তৈরি শ্রীমান ধুন্ধুর মতোই কোনও রোবোট আছে। কিন্তু সে-রোবোট ধুন্ধুর চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তার দেহ ধাতু দিয়ে তৈরি নয়।"

"কৃত্রিম হাড়-মাংস-চামড়া দিয়ে তৈরি!"

"ঠিক, ঠিক।" চন্দ্রকান্ত নড়ে বসলেন। "কিন্তু ওইসব জিনিসকে একেবারে কৃত্রিম বলতে দ্বিধা হচ্ছে। সম্ভবত মৃত মানুষের দেহকোষের ডি এন এ অণুতে কোনও প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে হাড়-মাস-রক্ত-চামড়া ইত্যাদি তৈরি

করেছেন রাজেন অধিকারী। তারপর জোড়া দিয়ে একটা মানুষ গড়েছেন।”

“জেনোম প্রজেক্ট তা হলে সফল করতে পেরেছেন রাজেনবাবু?”

বিজ্ঞানী চিবুকের দাড়ি চুলকে বললেন, “সম্ভবত।”

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, “কাল রাতে দানোটা আমাকে—”

হাত তুলে চন্দ্রকান্ত বললেন, “শুনেছি। কিন্তু কান ধরলে কেন ও জব্দ হয় জানেন কি? আমার কাছে শুনুন। আপনাকে আমার ‘সোনিম’ থিওরির কথা বলেছি। রাজেনবাবুর এই রোবোটটিও ধ্বনিতরঙ্গের সাহায্যে চালিত হয়। কানই ধ্বনিতরঙ্গের একমাত্র গমনপথ। কাজেই ওর কান চেপে ধরলে রাজেন-বাবুর রিমোট কন্ট্রোল থেকে পাঠানো ধ্বনিতরঙ্গ ওর ব্রেনে ঢুকতে বাধা পায়। তখন স্বভাবত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।”

কর্নেল বললেন, “আমার ধারণা, ওর কানের সঙ্গেই কোনও সূক্ষ্ম রিসিভিং যন্ত্র ফিট করা আছে। কানে চাপ পড়লে কিছুক্ষণের জন্য সেটা অকেজো হয়ে যায়।”

বললাম, “রাজেনবাবুর দাদা বসন্তবাবু সেটা জানেন?”

“যেভাবে হোক, জানতে পেরেছেন।” বলে কর্নেল চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজলেন।

“কিন্তু সম্রাট ইয়াজদার্গির্দের হিরের কোনও খোঁজ পেলেন না চন্দ্রকান্তবাবু? আপনার ডিটেক্টরে কোনও খোঁজ মেলেনি?”

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, “নাহ্। রাজেনবাবুর বাড়িতে কোনও হিরে-টিরে নেই মশাই!”

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, “চন্দ্রকান্তবাবু! আপনার ওই যন্ত্রটি কতটা দূরত্বের পরিধি খুঁজতে পারে?”

“চারদিকে একশো মিটার পরিধির দূরত্ব খুঁজতে পারে।”

“ওপরের দিকে?”

“ভার্টিক্যালি?” চন্দ্রকান্ত একটু হাসলেন। “আমি হাত তুললে যতটা উঁচু হয়, ততদূর পর্যন্ত।”

“তার মানে দোতলার কিছু ডিটেক্ট করা যায় না আপনার যন্ত্রে?”

“নাহ্। আসলে রাজেনবাবুর বাড়িতে এম পি ডি আমার বুকপকেটে রাখাছিল। হাতে ওটা দেখলে ওঁর সন্দেহ হত কি না বলুন?”

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে বললেন, “হ্যাঁ। কে? হালদারমশাই নাকি? কোথা থেকে বলছেন?…কী আশ্চর্য! ওখানে কেন গেলেন?…বলেন কী! কাকে দেখেছেন? বসন্তবাবুকে?…হ্যাঁ, প্রচুর রহস্য।…হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ওয়েট অ্যান্ড সি।…উইশ ইউ গুড লাক। রাখছি।”

কর্নেল ফোন রেখে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপরে বললেন, "হালদারমশাই গোপালপুর-অন-সি থেকে ট্রাঙ্ককল করে জানালেন, গত রাতে রাজেনবাবু এবং তাঁর দানোটিকে ফলো করে হাওড়া স্টেশনে যান। তখন রাত প্রায় এগারোটা। মাদ্রাজ মেল ছাড়ার কথা রাত আটটা ৪৫ মিনিটে। আড়াই ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। ওঁর ধারণা, রাজেনবাবু সে-খবর জেনেই দেরি করে স্টেশনে যান। যাই হোক, গোয়েন্দামশাই ওঁদের ফলো করে গোপালপুর-অন-সি-তে পৌঁছেছেন। উঠেছেন আমার বন্ধু স্মিথসায়েবের ওশান হাউসে। দোতলার বারান্দা থেকে এক পলকের জন্য নাকি সামনে বালিয়াড়িতে একটা ভাঙা ঘরের ভেতর বসন্তবাবুকে দেখেছেন। নেমে গিয়ে তাঁর আর পাত্তা পান নি। এদিকে রাজেনবাবু উঠেছেন লাইটহাউসের ওদিকে ওবেরয় গ্র্যান্ডে। কাজেই—"

"ওঁর কথার ওপর বললাম, "প্রচুর রহস্য।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চোখ নাচিয়ে বললেন, "চলুন কর্নেল! গোপালপুর-অন-সি নিরিবিলি জায়গা। রাজেনবাবুর রোবোটটিকে জব্দ করে জেনেটিক্সের মিস্ট্রি সল্ভ করা যাবে। এই চান্স ছাড়া উচিত নয়।"

কর্নেল চোখবুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "গেলে আপনাকে খবর দেব।"

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, "নওরোজি জানতে পেরেছিলেন, কে হিরে চুরি করেছে। তাই তাঁকে মরতে হল। এবার হালদারমশাইয়ের বরাতে সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটে না যায়। আমাদের যাওয়া উচিত, কর্নেল!"

"হালদারমশাইকে কানমলার পরামর্শ দিয়েছি ডার্লিং! ভেবো না।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি কিন্তু যাচ্ছি। বিজ্ঞানের এমন রহস্যময় আবিষ্কার হাতে-নাতে যাচাইয়ের চান্স ছাড়তে রাজি নই কর্নেল! গোপালপুর উপকূলের মতো সুনসান নির্জন জায়গা ভারতের কোনও সমুদ্র-তীরে নেই। আমি রাজেনবাবুর অজ্ঞাতসারে রোবোটটির ওপর পরীক্ষা চালাব।"

উনি খুব জোরে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল ধ্যানস্থ। বললাম, "চলি বস। আপনি ধ্যান করুন।"

তবু কর্নেলের সাড়া নেই। অগত্যা মনে-মনে চটে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে একটা কাজে বেরোতে যাচ্ছি, কর্নেলের ফোন এল। "জয়ন্ত! তৈরি হয়ে থাকো। আমি আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।"

"কী ব্যাপার?"

"আমরা গোপালপুর-অন-সি রওনা হব।"

"অ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ। এইমাত্র ম্যাডানসায়েবের জামাই কুসরো এসেছিলেন। আজ ভোরবেলায় গোপালপুর-অন-সি বিচে তাঁর শ্বশুর ম্যাডানসায়েবকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশ ট্রাঙ্ককলে লালবাজারের থ্রু দিয়ে খবর দিয়েছে।"

"মার্ডার নাকি ?"

"তা আর বলতে ? তবে ঘাড় মটকে মারা হয়েছে।"

"সেই শয়তান রোবোটটা ! সেই দানো ব্যাটাচ্ছেলে !"

"তৈরী থেকো, ডার্লিং ! যাচ্ছি।"

ফোন নামিয়ে রেখে দেখি, এই শীতে ঘাম দিচ্ছে। শরীর কাঁপছে। আবার সেই বিভীষিকার মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে ? জীববিজ্ঞানী রাজেন অধিকারী যদি তাঁদের দানোর কানের বদলে এবার অন্য কোনও প্রত্যঙ্গে গোপনে রিসিভার-যন্ত্র ফিট করে রাখেন ?

॥ ৪ ॥

বাসে চেপে পুরী। পুরী থেকে ফের বাসে চিল্কা রেলস্টেশন। তারপর ট্রেনে গঞ্জাম জেলার বহরমপুর স্টেশন। সেখান থেকে প্রাইভেট-কার ভাড়া করে গোপালপুর-অন-সি-তে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় দশটা। সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারের দিকে স্মিথসায়েবের 'ওয়াশ হাউস'। স্মিথসায়েব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। একসময় কলকাতার বন্দর অফিসে চাকরি করতেন। কর্নেলের পুরনো বন্ধু।

বাড়ির নীচের তলায় উনি থাকেন। ওপরতলায় দুটো স্যুট। একটাতে হালদারমশায় আছেন।

আছেন, মানে ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু এ-মুহূর্তে নেই। দরজায় তালা আঁটা। স্মিথসায়েব তাঁর 'গেস্ট'দের ব্যাপারে নাক গলান না। তবে স্মিথসায়েবের মতে, এই গেস্ট ভদ্রলোক ছিটগ্রস্ত। কারণ আজই বিকেলে তাঁকে বিচের মাথায় মুঘল আমলের ভাঙাচোরা পাথুরে বাড়িগুলির ভেতর সন্দেহজনক-ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। সন্ধের দিকে একবার তাঁকে বিচে জগিং করতেও দেখেছেন। স্মিথসায়েব ওঁর প্রতি বেজায় অখুশি।

স্মিথসায়েব গেস্টদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ওঁর পরিচারিকা মারিয়াম্মা আমাদের খাবার দিয়ে গেল। দেখলাম কর্নেল তার সুপরিচিত।

কর্নেল তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "পাশের ভদ্রলোক কি খেয়ে বেরিয়েছেন ?"

মারিয়াম্মা বলল, "উনি বাইরে খান। কখন আসেন কখন যান, জানি না।"

সে এঁটো থালাবাটি গুছিয়ে চলে যাচ্ছে, কর্নেল ডাকলেন, "একটা কথা, মারিয়াম্মা !"

"বলুন সার !"

"আসার পথে শুনলাম নীচে নাকি কে খুন হয়ে পড়ে ছিল আজ ?"

মারিয়াম্মা বুকে ক্রস এঁকে ভয়পাওয়া গলায় বলল, "সে এক বীভৎস দৃশ্য সার ! শয়তান ছাড়া এ-কাজ কার হতে পারে ? মাথাটা মুচড়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।" সে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে গলার স্বর চাপা করল। "জেলেবস্তিতে শুনেছি, গতকাল সন্ধ্যায় ওরা একটা অদ্ভুত পাখিকে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসতে দেখেছে। পাখিটার ডানা নাকি বিশাল। দক্ষিণে লাইটহাউসের ওধারে উঁচু বালির টিলা আছে। সেদিকেই পাখিটা এসে নেমেছিল। শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়।"

মারিয়াম্মা চলে গেলে বললাম, "মারিয়াম্মার গল্পটা বিশ্বাস করলেন ?"

কর্নেল দাড়ি নেড়ে চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর বললেন, "হ্যাঁ !"

"আমি পাখিটার কথা বলছি !"

"আমিও তা-ই বলছি।"

"গুল !" বলে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কর্নেল এসবে বিশ্বাস করেন ভাবা যায় না।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে টানতে বললেন, "হালদারমশাই পাখিটার পাল্লায় পড়লেন কি না ভাবছি। এখনও ফিরলেন না। যাইহোক, একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব।"

এত রাতে কোথায় বেরোবেন ?"

কর্নেল হাসলেন ! "গোপালপুর অন-সি-তে শীতের তত উপদ্রব নেই। সমুদ্রতীরের আবহাওয়া সবসময় নাতিশীতোষ্ণ।"

বাইরে খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এই দোতলা থেকে সামনে বালিয়াড়ির নীচে সমুদ্র দেখা যায়। কুয়াশার আড়ালে সমুদ্র ঢাকা পড়েছে। ছেঁড়া ঘুড়ির মতো চাঁদটাকে অসহায় দেখাচ্ছে। মুঘল আমলের ভাঙচুর বাড়িগুলো কুয়াশামাখানো আবছা জ্যোৎস্নায় বড্ড বেশি ভুতুড়ে। বিচে ক্রমাগত ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা নেই। কিন্তু বিরক্তিকর।

বাঁদিকে বালিয়াড়িতে কালো লম্বাটে জিনিসগুলো দেখেই বুঝলাম জেলেদের ভেলানৌকো। সেখানে আবছা একটা মূর্তি দেখতে পেলাম। এত রাতে সামুদ্রিক শীতের হাওয়া খেতে কে বেরোল কে জানে !

একটু পরে মূর্তিটা সটান এসে এই বাড়ির নীচের রাস্তায় দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বললাম, "হালদারমশাই নাকি ?"

তখনই ছায়ামূর্তিটা বাঁ দিকের রাস্তায় চলে গেল। তারপর একেবারে নিপাত্তা। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল উঠে দাঁড়িয়েছেন আমি কিছু বলার আগেই বললেন, "চলো বেরনো যাক।"

দরজায় তালা এঁটে আমরা নেমে এলাম। রাস্তায় পৌঁছে সন্দেহজনক লোকটার কথা বললাম। কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। খুব ভয়ে-ভয়ে হাঁটছিলাম। কখন কোথায় দানোটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বলা যায় না। রাস্তা খাঁ-খাঁ, জনহীন। ল্যাম্পপোস্টগুলো দূরে-দূরে। তাই কোথাও-কোথাও জ্যোৎস্না-কুয়াশা-আঁধার মিলেমিশে আছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর বললাম, "আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?"

কর্নেল সামনে আঙুল তুলে বললেন, "ওই যে আলো জুগজুগ করছে, ওখানে।"

যেখানে পৌঁছেছি, সেখানটা কাঁচা রাস্তা। বালিতে ভর্তি। দুধারে ঝোপঝাড়। কিছু উঁচু গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলের হাতে টর্চ আছে। কখনও পায়ের সামনে আলো ফেলছেন। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল এসে আমার গায়ে লাগল। ভীষণ চমকে উঠে বললাম, "কর্নেল! কে ঢিল ছুঁড়ছে।"

কর্নেল বললেন, "ভূত! চলে এসো।"

"কী আশ্চর্য! সত্যি ঢিল ছুঁড়ল যে!"

কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে আবার পর-পর কয়েকটা ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলো ফেলামাত্র ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হল। কেউ কোথাও নেই। অথচ কে ঢিল ছুঁড়ছে রাতদুপুরে? কর্নেল চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "দৌড়তে হবে। কুইক!"

কর্নেল সত্যি দৌড়তে শুরু করলেন। আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম। এই সময় পেছনে কোথাও খিখিখিখি···হিহিহিহি···হোহোহোহো···এই ধরনের বিকট হাসি শোনা গেল।

কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেলেন। বললাম, "কী অদ্ভুত—"

"ভূত!" কর্নেল হাঁসফাঁস করে বললেন। "রোসো! মিনিট দু-তিন জিরিয়ে নিই। বাপস! বালিতে দৌড়নো সহজ নয়।"

কিছুক্ষণ পরে সেই আলোর কাছে পৌঁছে দেখি, গাছপালার আড়ালে একটা বাড়ি এবং গেটে সঙ্গীনধারী পুলিশ। বুঝলাম থানায় এসেছি।

দু'জন অফিসার একটা ঘরে বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখেই এক গলায় সম্ভাষণ করলেন, "হাই ওল্ড বস!"

আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর জানলাম একজন সি আই ডি ইনস্পেক্টর সুরঞ্জন দাস, অন্যজন অফিসার-ইন-চার্জ জগপতি রাউত। দুজনেই চমৎকার বাংলা বলেন। সুরঞ্জনবাবু বললেন, "দেরি দেখে ভাবছিলাম ওশান হাউসে গিয়ে

খোঁজ নিই! কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

কর্নেল বললেন, "নাহ্‌। চমৎকার এসেছি।"

জগপতিবাবু বললেন, "আমি বহরমপুর-গঞ্জাম স্টেশনে জিপ পাঠাতে চেয়েছিলাম। মিঃ দাস নিষেধ করলেন। আপনি নাকি পুলিশের জিপে চাপা পছন্দ করেন না!"

জগপতিবাবু হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন, "কখনও-কখনও করি না। ওতে আমার কাজের অসুবিধে হয়। যাই হোক, মিঃ দাস, সেই চিঠিটা দেখতে চাই।"

সুরঞ্জনের ইশারায় জগপতিবাবু দেওয়ালে আঁটা আয়রনচেস্ট থেকে একটা ফাইল বের করলেন। ফাইলের ভেতর একটা কাগজে সাঁটা অজস্র কাগজকুচি এবং কুচিগুলোতে কিছু লেখা আছে। কর্নেল ঝুঁকে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর হাতে আতসকাচ বেরিয়ে এসেছে।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, "কুচিগুলো ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলের ওদিকে নীচু জমিতে পড়ে ছিল। শিশিরে অধিকাংশ চুপসে গেছে। আর পড়ার উপায় নেই। আমি যেভাবে জোড়াতালি দিয়েছি, তা ভুল হতেই পারে। তবে মোটামুটি এটুকু বোঝা যায়, কেউ ম্যাডানসায়েবকে এখানে আসতে বলেছিল। হাতের লেখা হিজিবিজি। তাছাড়া ইংরেজি বানানও ভুল।"

জগপতি বললেন, "ঠিক তাই। ভদ্রলোককে মার্ডার করার জন্যই ডেকেছিল। জুয়েল ফেরত দেওয়াটা ছল।"

বুঝলাম, এঁরা সম্ভবত কেসটা জানেন। বললাম, "কিন্তু ঘাড় মটকে খুন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?"

জগপতি হাসলেন। "ভূতের কীর্তি বলে রটেছে। তাছাড়া আগের রাতে নাকি প্রকাণ্ড একটা পাখি সমুদ্র থেকে উড়ে আসতে দেখেছে জেলেরা। তবে মর্গের রিপোর্টে বলছে, সত্যিই কতকটা ঘাড় মটকে—মানে মুণ্ডুটা মুচড়ে ঘুরিয়ে খুন করেছে। প্রকাণ্ড জোর আছে খুনির গায়ে।"

বললাম, "তা হলে—"

এবার বাধা দিলেন কর্নেল! রুষ্টভাবে বললেন, "প্লিজ জয়ন্ত! এখন কোনও প্রশ্ন নয়।"

চুপ করে গেলাম। একটু পরে কর্নেল ফাইলটা ফেরত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "মিঃ দাস। কাল সকালে, ধরুন আটটা নাগাদ আমি সি-বিচে অপেক্ষা করব। আপনি আমাকে দেখিয়ে দেবেন, কোথায় ম্যাডানসায়েবের বডি পড়ে ছিল।"

সুরঞ্জনবাবু বললেন, "অবশ্যই। আর আপনি বলেছিলেন গ্র্যান্ডে গত তিনদিনের আবাসিকদের লিস্ট দিতে। এই নিন। এতে আপনার বলা নামের কেউ নেই। একুশ নম্বর ডাবলস্যুটে দু'জন ভারতীয় আছেন। একজন

অবাঙালি মুসলিম মইনুদ্দিন আমেদ এবং অন্যজন তাঁর গোয়ানিজ বন্ধু পিটার নাজারেথ। দুজনেই চামড়াব্যবসায়ী। নাজারেথ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শয্যাশায়ী অবস্থা।"

"আমেদের মুখে দাড়ি আছে কি ?"

"আছে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম। মাথায় টুপি। পরনে শেরোয়ানি-চুস্ত।" সুরঞ্জনবাবু আমাদের বিদায় দিতে এলেন। গেটের কাছে এসে বললেন, "আপনার সন্দেহভাজন লোক দুটো এখানকার কোনও হোটেলে ওঠেনি"। তন্নতন্ন খোঁজা হয়েছে ! তবে কারও বাংলো বা বাড়িতে খুঁজতে সময় লাগবে ! আবার এমনও হতে পারে, তারা ম্যাডানসায়েবকে খুন করেই চলে গেছে।"

"আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর নিয়েছেন ?"

"আজ দুপুরে থানায় এসেছিলেন। আপনি আসছেন কি না জানতেই এসেছিলেন। কিন্তু উনি তো ওশান হাউসেই আছেন ?"

"আছেন। তবে দেখা হয়নি। ওঁর সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা আছে, মিঃ দাস ! খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ মানুষ। কোনও বিপদে না পড়েন !"

সুরঞ্জনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "কথাবার্তা হাবভাবেই সেটা বুঝেছি। আমাকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, রিটায়ার করেই যেন কলকাতা চলে যাই এবং ওঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ঢুকি।"

সুরঞ্জনবাবু চলে গেলেন। এবার কর্নেল অন্য রাস্তায় এগোলেন। এটা পিচমোড়া সুন্দর রাস্তা। দু'ধারে ল্যাম্পপোস্ট। কর্নেল বললেন, "ওই রাস্তাটা শর্টকাট ছিল। এই রাস্তায় ওশান হাউস অনেকটা দূর। কিন্তু উপায় নেই ডার্লিং ! এই শীতের রাতে ভূতের ঢিল খেতে আমার আপত্তি আছে।"

বললাম, "ভূত-টুত নয়। রাজেনবাবু সেই দানোকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন ! আমাদের ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোই ওঁর উদ্দেশ্য।"

"জয়ন্ত, রাজেনবাবু ইচ্ছে করলে তাঁর দানোর হাতে লেসারঅস্ত্র দিয়ে আমাদের ছাই করে দিতে পারেন।"

আঁতকে উঠে বললাম, "সর্বনাশ ! তা হলে বড্ড বেশি ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে যে ?"

কর্নেল হাসলেন। "তা হচ্ছে। চিন্তা করো, ম্যাডানসায়েবের বাড়ির মাটির তলার ঘরে লুকনো ইস্পাতের ভল্ট গলিয়ে হিরে চুরি ! ইস্পাত গলানোর চেয়ে মানুষ গলানো এবং ছাই করা কত সোজা ! তাছাড়া লেসারঅস্ত্র দূর থেকে প্রয়োগ করা যায়। দানোটা তোমাকে কানমলার সুযোগই দেবে না।"

হেসে ফেললাম। "ভ্যাট ! হেঁয়ালি করা আর ভয় দেখানো আপনার স্বভাব।"

হঠাৎ কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, "স্বভাব কী বলছ জয়ন্ত !

ওই দ্যাখো, গাছের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কুইক! আমরাও লুকিয়ে পড়ি।"

রাস্তার দু'ধারে গাছ এবং ঝোপঝাড়। মাঝে-মাঝে একটা করে বাংলোবাড়ি। কর্নেল আমাকে টেনে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। গুঁড়ি মেরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম দু'জনে। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

এক সময় কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তেমনই চাপা স্বরে বললেন, "চলো!"

রাস্তায় গিয়ে বললাম, "কোথায় লোক দেখলেন?"

কর্নেল বললেন, "ওই দ্যাখো, চলে যাচ্ছে!"

আন্দাজ তিরিশ মিটার দূরে রাস্তার বাঁকে একটা আবছা মূর্তি সদ্য মিলিয়ে যাচ্ছে। হন্তদন্ত হেঁটে বাঁকে পৌঁছে দেখি, আবছা মূর্তিটা যেন হাঁটছে না। রাস্তার ওপর ভেসে যাচ্ছে।

সে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলে কর্নেল বললেন, "কপালে দুর্ভোগ আছে ডার্লিং! আবার বালি আর জঙ্গল ভাঙতে হবে। একটা বালির টিলা ডিঙোতেও হবে। এসো।"

পা বাড়িয়ে বললাম, "ও কে?"

"সেই দানোটা বলেই মনে হল। হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে। বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলাম। তবে ঝুঁকি নেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ম্যাডান-সায়েবকে মেরে রাজেন অধিকারী গোপালপুর-অন-সি ছেড়ে চলে যায়নি এটা জানা গেল। কিন্তু কেন যায়নি, সেটাই রহস্য। এটা জানা গেলেই রহস্যের সমাধান হবে। এমনকি, ইয়াজদাগির্দের হিরেও সম্ভবত উদ্ধার করতে পারব।"

বালিয়াড়ি, জঙ্গল এবং একটা আস্ত বালির পাহাড় ডিঙিয়ে সমুদ্রের বিচে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তারপর ওশান হাউসে যখন পৌঁছলাম, তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। পা নাড়তেই যন্ত্রণা কটকট করে উঠছে।

হালদারমশাইয়ের স্যুটে তেমনই তালা আঁটা। ফেরেন নি। কোনওরকমে জুতো খুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। অভ্যাসমতো প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, "যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, দানোটা এসে তোমার ঘাড় মটকাবার চমৎকার সুযোগ পেত।"

বললাম, "আপনি যেভাবে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন, আপনারও ঘাড় মটকানোর সুযোগ ছিল।"

"দেখা যাচ্ছে, সে এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে না।"

"কিন্তু গত রাতে সে গাছের আড়ালে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল!"

কর্নেল প্রজাপতি ধরা জাল ঝেড়ে মুছে গুটিয়ে রাখছিলেন। বললেন, "আমাদের জন্য ওত পাততে যায়নি। জায়গাটা দেখে এলাম। ওড়িশার এক

প্রাক্তন মন্ত্রীর বাংলোবাড়ির কাছে সে দাঁড়িয়েছিল। ওই বাড়িতে এমন কেউ আছে, যার ঘাড় মটকাতে গিয়ে থাকবে। কোনও কারণে সে-সুযোগ পায়নি। তাই তাকে রাজেন অধিকারী সরিয়ে নিয়েছে, কিংবা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। হ্যাঁ—রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যেই।"

সায় দিয়ে বললাম, "ঠিক বলেছেন। দানোটা গুলতির বেগে যেন ভেসে যাচ্ছিল।"

বাথরুম সেরে এসে দেখি, মারিয়াম্মা ব্রেকফাস্ট এনেছে। খেতে বসে কর্নেল বললেন, "বাংলোবাড়িটার দরজায় তালা। পরে খোঁজ নেব, কে আছে ওখানে। প্রাক্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কদাচিৎ আসেন শুনলাম। এলে ওঁর লোক-জনও সঙ্গে থাকে। কেউ নেই। সম্ভবত ওঁর কোনও পরিচিত লোক এসে থাকবে। তবে সে যে-ই হোক, তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।"

হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল এতক্ষণে। বললাম, "হালদার-মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। তখনই উঠে গিয়ে দেখে এলাম, ওঁর স্যুটের দরজায় তেমনই তালা আঁটা। অজ্ঞাত ত্রাসে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে সি আই ডি ইনস্পেকটর সুরঞ্জনবাবু এসে গেলেন। আমরা সামনের বালিয়াড়ি পেরিয়ে গেলাম। বিচে তত কিছু ভিড় নেই। বিচ ধরে প্রায় আধ কিমিটাক হাঁটার পর লাইটহাউস ছাড়িয়ে গিয়ে বালির একটা টিলার কাছে পেঁছিলাম। সুরঞ্জনবাবু দেখিয়ে দিলেন, কোথায় ম্যাডানসায়েবের মৃতদেহ পড়ে ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে বালির বিশাল টিলাগুলো দেখছিলেন। হঠাৎ হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। তারপর টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। আমরা ওঁকে অনুসরণ করলাম। টিলার মাথায় উঠে কর্নেল বললেন, "ম্যাডানসায়েবের জুতোর ছাপ কিনা জানি না। তবে ছাপগুলো লক্ষ্য করুন মিঃ দাস! পশ্চিম-দিকের ঢাল থেকেই ছাপগুলো উঠে এসেছে। ওই দেখুন। স্বাভাবিক চড়াইয়ে ওঠার ছাপ। ওদিকে বালিটা জমাট। এই টিলার মাথায় আসার পর বিচের দিকে নেমে যাওয়া ছাপগুলো দেখুন। বিচের দিকটা ঢালু। বালি নরম। ক্রমশ স্টেপিংয়ের দূরত্ব বেড়েছে। ছাপও গভীর হয়েছে। বাঁ দিকে কোনাকুনি নেমে গেছে ছাপগুলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক দৌড়ে নেমেছিলেন। কিন্তু বাঁ দিকে কোনাকুনি কেন? চুড়োয় এসে নীচে বাঁ দিকে কি কাউকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?"

কর্নেল বাইনোকুলারে ডান দিকটা দেখে এগিয়ে গেলেন। বললেন, "এই যে! এখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল। মাই গুডনেস! সে একলাফে প্রায় তিরিশ ফুট নীচে পড়েছে। ওই দেখুন গভীর দুটো ছাপ।" কর্নেল নেমে

[illegible] হাতও। আবার খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "ডেডবডির দূরত্ব এখান থেকে আরও তিরিশ ফুট। জোয়ারের জল ওখান পর্যন্ত আসে না। তার মানে, সে দ্বিতীয় লাফে ম্যাডানসায়েবকে ধরে ফেলেছে। অস্বাভাবিক লং জাম্প!"

সুরঞ্জনবাবু ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন, "অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব!"

॥ ৫ ॥

রাজেন অধিকারীর দানোটার কথা বলার জন্য উসখুস করছিলাম। কিন্তু কর্নেলের হাবভাব আঁচ করেছি, পুলিশকে তিনি হাতের তাস দেখাতে চান না। অবশ্য বরাবর তাঁর এই স্বভাব।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, "কর্নেল! আপনার এই থিওরিটা কিন্তু মানতে পারছি না। যে তিরিশ ফুট লং জাম্প দিতে পারে, সে অলিম্পিকের মেডেল-জেতা খেলোয়াড়। আপনি কি বলতে চাইছেন খুনি কোনও খেলোয়াড়?"

কর্নেল বাইনোকুলারে দূরে বিচের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন দেখছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "চলুন ফেরা যাক।" তারপরে হাঁটতে-হাঁটতে ফের বললেন, "খেলোয়াড় বৈ-কি। মিঃ দাস, আমরা এক সাঙ্ঘাতিক খেলোয়াড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

সুরঞ্জনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে ঘড়ি দেখে বললেন, "আমাকে এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। পরে যোগাযোগ করব'খন।"

উনি চলে যাওয়ার পর আমরা বিচ ধরে হাঁটছিলাম। ডাইনে সমুদ্রে এখানে-ওখানে কালো-কালো ছোটবড় পাথর দেখা যাচ্ছে। ঢেউয়ে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। মুহুর্মুহু ব্রেকারের গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। চাপ-চাপ ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে। বিচের মাথার পাথরে তৈরি ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। প্রকাণ্ড সব পাথরের চাঙড় বিচে এসে পড়েছে। একটা ভাঙা ঘরের জানালায় কাউকে উঁকি মারতে দেখলাম। গোলগাল মুখ। মুখে কেমন একটা হাসি। হঠাৎ মুখটা চেনা মনে হল। তখনই মনে পড়ে গেল, রাজেনবাবুর বাড়ির দোতলার জানালায় এই মুখটাই দেখেছিলাম। দ্রুত বললাম, "কর্নেল! কর্নেল! ওই দেখুন সেই বসন্তবাবু। রাজেনবাবুর দাদা।"

কর্নেল বললেন, "দেখেছি। ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও কি?"

"ওঁর কাছে জানা দরকার, উনি এখানে কেন এসেছেন।"

"চলে যাও তা হলে।"

"আপনিও চলুন!"

কর্নেল হাসলেন। "ডার্লিং! আমি পাগলকে বড্ড ভয় করি, সে তো

ঙমি জানো! তুমি ইচ্ছে করলে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারো। যাও, চলে যাও!"

তীব্র কৌতূহলের চাপে পড়েই পাথরের চাঙড় বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। ওপরে উঠে সেই ভাঙা পাথুরে ঘরটার দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলাম। কিন্তু জানলায় দেখা সেই মুখটা নেই।

ভেতরে উঁকি মেরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘরগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে চারদিকে তন্নতন্ন খুঁজে আর বসন্তবাবুর পাত্তা পেলাম না। সবখানে বালির স্তূপ। পোড়ো-পোড়ো ঘরগুলোর মেঝেও বালিতে ভর্তি। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ওধারে পিচ রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় গিয়ে একপলকের জন্য দেখলাম, বসন্তবাবু ওপাশের একটা পোড়ো জমির পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন। পাগলের পেছনে দৌড়ানোর মানে হয় না।

বিচে ফিরে গিয়ে কর্নেলকেও দেখতে পেলাম না। অদ্ভুত মানুষ তো!

খানিকটা হেঁটে জেলেদের ভেলানৌকোর কাছে পৌঁছলাম। উঠে গিয়ে ওশান হাউস চোখে পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখি নীচের বারান্দায় বসে স্মিথসায়েব হোমিওপ্যাথির ওষুধ বিলোচ্ছেন। একদঙ্গল গরিবগুরবো চেহারার রুগী দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে স্মিথসায়েব সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং!"

"মর্নিং মিঃ স্মিথ! কর্নেলসায়েব কি ফিরেছেন?"

"ফিরলে দেখতে পেতাম।"

"মিঃ হালদার?"

স্মিথ উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "না। আমি চিন্তিত মিঃ চৌধুরী। পুলিশকে খবর দিয়েছি।"

আমার ঘরের চাবি কর্নেলের কাছে। ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় স্মিথসায়েবের কাছে আছে। কিন্তু ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। আবার বিচে ফিরে গেলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চমৎকার সময় কাটানো যায়। এদিকটা একেবারে খাঁ-খাঁ জনহীন। জেলেবস্তির ছোট্ট ছেলেমেয়ের দঙ্গল খানিকটা দূরে সমুদ্রে নেমেছে। ওটাই ওদের খেলা। কেউ-কেউ জলের ভেতর উঁচিয়ে থাকা পাথরেও উঠেছে। ওদের ভয় করছে না?

নিশ্চয় করছে না। সমুদ্র ওদের আপনজন। সমুদ্র ওদের লড়াই করে বেঁচে থাকতে শেখায়। ওরা যেন সমুদ্রের পাঠশালার পড়ুয়া।

কতক্ষণ পরে আনমনে ডানদিকে মুঘল আমলের ভাঙা কুঠিবাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা মাথা উঁকি মেরে এগোচ্ছে। স্তূপের আড়াল দিয়ে কেউ গুঁড়ি মেরে কোথাও চলেছে। একটু পরে আর তাকে

দেখা গেল না। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বসন্তবাবু নন তো ?

বালি ও ধ্বংসস্তূপ এবং ভাঙা ঘরের ফোকর গলিয়ে সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘরের বালিতে পড়ে থাকা একটা কাগজের চিরকুট দেখতে পেলাম। চিরকুটটা পড়ে নেই আসলে। একটুকরো পাথর চাপা দেওয়া আছে এক কোনায়।

চিরকুটটা তুলে দেখি, আঁকাবাঁকা ইংরেজি হরফে যা লেখা আছে, তার মানে দাঁড়ায় ঃ

"আজ রাত দশটায় এখানে আসুন। দেখা হবে।"

হালদারমশাইয়ের ভাষায় প্রচুর রহস্য। ঝটপট ভেবে নিয়ে চিঠিটা সেই অবস্থায় রেখে দিলাম। তারপর তেমনই গুঁড়ি মেরে এগিয়ে খানিকটা তফাতে একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে বসে রইলাম। এখান থেকে ওই ঘর এবং নীচের বিচ মোটামুটি চোখে পড়ে।

এমন ভঙ্গিতে বসেছিলাম, কেউ দেখলে ভাববে, নিছক সমুদ্রদর্শন করছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিচের দিক থেকে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলাম। প্রথমে তাকে সায়েব ভেবেছিলাম। পরে দেখি খাঁটি সায়েব নয়। তবে কতকটা সায়েব-সায়েব গড়ন। লম্বা নাকটা দেখার মতো। পরনে জিনস-জ্যাকেট। মাথায় রোদ-বাঁচানো টুপি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ মনে হল।

লোকটা সেই ঘরের কাছে এসে চাপা গলায় কাকে ডাকল, "হ্যালো।"

বারকতক ডাকার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ঘরের ভেতর উঁকি দিল। তারপর ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ল।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। হন্তদন্ত ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ফোকরের সামনে দাঁড়ালাম। লোকটা চমকে উঠেছিল। সামলে নিয়ে ইংরেজিতে বলল, "এই পাথরের বাড়িগুলো ভারী অদ্ভুত। কে তৈরি করেছিল জানেন কি ?"

চার্জ করার ভঙ্গিতে বললাম, "কে আপনি ?"

"ট্যুরিস্ট। আশা করি, আপনিও ট্যুরিস্ট ?"

তার কথায় কান না করে বললাম, "ওখানে একটা চিঠি ছিল, চিঠিটা নিতেই কি আপনি এসেছেন ?"

"চিঠি! কী বলছেন আপনি ?"

"ঠিক বলছি। চিঠিটা আমি দেখেছি। আপনি সেটা নিয়েছেন। এবার বলুন কে আপনি ?"

পেছন থেকে কর্নেলের কথা ভেসে এল। "সাবধান ডার্লিং! সেই দানোর কথা ভুলে যেও না।"

শোনামাত্র ভ্যাবাচাকা খেয়ে একলাফে লোকটার কান ধরতে গেলাম। লোকটাও একলাফে সরে গেল। কর্নেল এসে অট্টহাসি হেসে বললেন, "সেমসাইড হয়ে যাচ্ছে জয়ন্ত! আলাপ করিয়ে দিই, ইনি ম্যাডানসায়েবের জামাই মিঃ কুসরো। আর মিঃ কুসরো! আমার স্নেহভাজন বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী মাঝে-মাঝে অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ে। আসলে এটা ওর ভয় পাওয়ারই প্রতিক্রিয়া!"

কুসরো হেসে ফেললেন। "সত্যি বলতে কি, আমি ভয় পেয়েছিলাম। যাই হোক, সেই ভদ্রলোক আমার জন্য একটি চিঠি রেখে গেছেন। এই দেখুন।"

কর্নেল চিঠিটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন, "এটা আমার কাছে থাক। রাত ন'টা নাগাদ ওশান হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর সব ব্যবস্থা হবে। আপনি বরং নীচের দিকে না গিয়ে সদর রাস্তা ধরে বাংলোয় যান। সাবধানে যাবেন।"

কুসরো তখনই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন। বললাম, "শ্বশুর চিঠির ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এবার জামাইকেও চিঠির ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। ব্যাপারটা এইতো?"

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন, "তখন বসন্তবাবুকে কোথায় হারিয়ে ফেললে?"

"রাস্তার ওধারে। তো মিঃ কুসরো কি শ্বশুরের ডেডবডি নিতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। ওঁর বাবার বন্ধু এক প্রাক্তন মন্ত্রীমশাই। তাঁর সাহায্যে আর্মির হেলিকপ্টারে ম্যাডানসায়েবের বডি সকালেই কলকাতা পাঠানো হয়েছে। কুসরো যাননি। মানে, কলকাতায় উনি যখন আমাকে ফোন করেন, তখন আমি ওঁকে একটা দিন থেকে যেতে বলেছিলাম। তবে জানতাম না, কুসরো মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলোয় উঠেছেন। উঠে অবশ্য ভালই করেছেন। কারণ আমাদের প্রিয় বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর সান্নিধ্যে থাকলে উনি নিরাপদ।"

অবাক হয়ে বললাম, "ওই বাংলোতে চন্দ্রকান্তবাবুও উঠেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। চলো, চন্দ্রকান্তবাবুকে ওশান হাউসে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

বুঝলাম, আমি যখন বসন্তবাবুর পেছনে ছুটছিলাম, তখন কর্নেল আমাকে ফেলে সেই বাংলোয় চলে গিয়েছিলেন। তাই ওঁকে আর দেখতে পাইনি। কিন্তু হঠাৎ ওভাবে চলে না গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। কেন করেন নি? এমন কী ঘটেছিল যে, প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলোর দিকে ছুটে গিয়েছিলেন?

যেতে-যেতে কথাটা তুললাম। কর্নেল বললেন, "বাইনোকুলারে দেখেছিলাম, বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ওঁর ডিটেক্টর যন্ত্র নিয়ে ব্যাকওয়াটারের ওদিকে

ঘুরঘুর করছেন। কাজেই ওঁর কাছে না গিয়ে পারলাম না। হ্যাঁ, গত রাতে দানোটা বাংলোয় ঢুকতে পারেনি। বিজ্ঞানীর কারবার! মারাত্মক কী অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে নাকি বাংলোটা ঘিরে রেখেছিলেন।"

"কিন্তু হালদারমশাইয়ের কী হল?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "জানি না।"

ওশান হাউসের দোতলায় আমাদের স্যুটে ঢুকে দেখি, বিজ্ঞানীপ্রবর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন। কারণ ওঁর নাক ডাকছে। আমি যেই 'চন্দ্রকান্তবাবু' বলে ডেকেছি, অমনিই তড়াক করে সোজা হলেন এবং বললেন, "হিরে আছে! শিওর!"

হাসতে-হাসতে বললাম, "স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?"

চন্দ্রকান্ত চোখ কচলে বললেন, "সরি! সারারাত ঘুমোইনি। ঘুমনো দরকার।" বলে আমার দিকে তাকালেন। "হ্যালো জয়ন্তবাবু! আসুন, আসুন। আপনার কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পরেছিলাম!"

"কেন বলুন তো?"

"হিরেটা উদ্ধার হয়ে গেলে আপনাকে একটা রোমহর্ষক স্টোরি দেব। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বেরোলে হইচই পড়ে যাবে। আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছে মশাই। ভাবা যায়? হিরেতে এক ধরনের রশ্মি আছে, যা প্রাণীর দেহকোষের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। হিরে ঠিক যেভাবে কাচ কাটতে পারে, সেইভাবে হিরের সেই বিস্ময়কর রশ্মিপ্রবাহ ডি এন এ অণুতে কেটেকুটে—" চন্দ্রকান্ত হঠাৎ কথা থামিয়ে ফিক করে হাসলেন।

কর্নেল আতসকাচ দিয়ে চিঠিটা দেখতে ব্যস্ত। আমাদের কথার দিকে ওঁর কান নেই।

বললাম, "চন্দ্রকান্তবাবু! আপনি বললেন, হিরে আছে। কোথায় আছে?"

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "এখানেই।"

"এখানেই মানে? গোপালপুর-অন-সি'-তে?"

"শিওর। ওই ব্যাকওয়াটারের কাছাকাছি কোথাও লুকনো আছে। ডিটেক্টরে সাড়া পেয়েছি কিন্তু ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারছি না, এটাই সমস্যা।"

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে বললাম, "হিরেটা এখানে এল কী করে? আনল কে? কেনই বা আনল?"

চন্দ্রকান্ত চিবুকের দাড়ি খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, "তা জানি না মশাই! কর্নেল ওসব রহস্য জানেন বলেই আমার ধারণা।"

কর্নেল চিঠিটা পকেটস্থ করে বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! মিঃ কুসরো বাংলোয় ফিরে গেছেন। লাঞ্চের সময় হয়ে এল। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।"

বিজ্ঞানী তখনই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "হ্যাঁ চলি! আমার একটা লম্বা ঘুমও দরকার।"

উনি চলে গেলে বললাম, "প্রাক্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কি চন্দ্রকান্তবাবুর পরিচিত?"

"পরিচিত না হলে চন্দ্রকান্তবাবু ওখানে উঠবেন কেন? বাংলোটা বেশ বড়। অনেক ঘর। কাজেই প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের পক্ষে তাঁর একাধিক প্রিয়জনকে ঠাঁই দেওয়ার অসুবিধে নেই। কেয়ারটেকার গোমস তাঁর প্রিয়জনদের সেবার জন্য বহাল রয়েছে।" বলে কর্নেল উঠলেন। "তুমি কি স্নান করবে? আমি বলি, বরং সমুদ্রে স্নান করে এসো। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।"

আঁতকে উঠে বললাম, "মাথাখারাপ? এখানকার সমুদ্র মানুষখেকো। সবসময় হাঁউমাউখাঁউ করে চেঁচাচ্ছে। জলের ভেতর পাথরগুলো যেন সমুদ্রের দাঁত। বুঝলেন তো? পেলেই পাথরের দাঁতে চিবিয়ে গিলে ফেলবে।"

"তা হলে সুইচ টিপে মারিয়াম্মাকে ডাকো। গরম জল করে দেবে। আমি তো সপ্তাহে একদিন স্নান করি। আজ আমার স্নানের দিন নয়।"

দুপুরের খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া আমার অভ্যাস। পুরনো বাংলায় একে বলে 'ভাতঘুম'। কিন্তু কর্নেল বাদ সাধলেন। বললেন, "এখনই মিলিটারির জিপ আসবে। তৈরি থাকো।"

মনে পড়ে গেল, এখানে সেনাবাহিনীর একটা ঘাটি আছে। ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে এসেছেন একটা রহস্যের সমাধানে। কিন্তু এসেই কখন সেনাবাহিনীর কোনও স্নেহভাজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে মিলিটারি জিপে আমরা যেখানে পৌঁছিলাম, সেটা উঁচুতলার অফিসারদের কোয়ার্টার এলাকা। বাংলোবাড়ি এবং সুদৃশ্য লন, ফুলবাগিচা। একটা বাংলোর লনে ঘাসের ওপর চেয়ারটেবিল পেতে একজন শিখ সামরিক অফিসার পাইপ টানছিলেন। কর্নেলকে দেখে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ করলেন। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিও এক কর্নেল। কর্নেল পরমজিৎ সিং।

পরমজিৎ বললেন, "পুরনো ক্যান্টিন-রেকর্ডে আপনার দেওয়া নামটা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ভদ্রলোক সোলজার্স ক্যান্টিনে ফুড সাপ্লায়ার ছিলেন।"

কর্নেল বললেন, "ওশান হাউসের মিঃ স্মিথের কাছে কথায়-কথায় জানতে পারি, এই নামের ভদ্রলোক একসময় এখানে ছিলেন। ফুড কন্ট্রাক্টরি করতেন। ধন্যবাদ কর্নেল সিং। অসংখ্য ধন্যবাদ!"

বেয়ারা কফি রেখে গেল। কফি খেতে খেতে পরমজিৎ একটু হেসে বললেন, "কিন্তু এবার যে রহস্যটা জানতে ইচ্ছা করছে কর্নেল সরকার? বুঝতে পেরেছি আপনার এবারকার গোপালপুর-অন-সি-তে আসার উদ্দেশ্য

সেই বিরল প্রজাতির 'জগন্নাথ প্রজাপতি' ধরা নয়, আমাদের একজন প্রাক্তন ফুড সাপ্লায়ারকে ধরা। কিন্তু রেকর্ডে ওঁর বিরুদ্ধে তো কিছুই নেই। অসুস্থতার জন্য কারবার গুটিয়ে কলকাতা ফিরে যান। উনি কি সেই জুয়েলার ম্যাডান-সায়েবের মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছেন ?"

কর্নেল জোরে মাথা নাড়লেন। "না, না! উনি অত্যন্ত সদাশয় পরোপকারী মানুষ।"

"তা হলে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, শুনি।"

"যথাসময়ে জানাব।"

এর পর দু'জনে সামরিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। আলাপ এবং কফি খাওয়া শেষ হলে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি কর্নেল সিং! পরে দেখা হবে। একটু তাড়া আছে।"

কর্নেলের নির্দেশে এবার মিলিটারি জিপ আমাদের লাইট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আমরা বস্তি এলাকার ভেতর দিয়ে একটা নীচু জায়গায় নেমে গেলাম। বললাম, "কোথায় যাচ্ছি ?"

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বালির টিলাগুলো দেখে নিয়ে বললেন, "চলো তো!"

যেতে-যেতে বললাম, "সেই ফুড সাপ্লায়ার ভদ্রলোক কে ?"

"বসন্ত অধিকারী।"

চমকে উঠে বললাম, "অ্যাঁ ?"

"হ্যাঁঃ।" কর্নেল হাসলেন। "বসন্তবাবুকে ঠিক বদ্ধ পাগল বলা চলে না। তবে মাথায় একটু গণ্ডগোল ঘটেছে, সেটা ঠিকই। এই গোপালপুর-অন-সি-র প্রত্যেকটি ইঞ্চি ওঁর নখদর্পণে। ডার্লিং! কাল রাত্তিরে উনিই ভূত হয়ে আমাদের ঢিল ছুঁড়ছিলেন। আমুদে চরিত্রের মানুষ। মজা করার সুযোগ পেলে ছাড়তে চান না।"

বালির টিলার কাছে পৌঁছে বললাম, "কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোন চুলোয় ?"

"ধৈর্য ধরো জয়ন্ত!" বলে কর্নেল টিলায় উঠতে থাকলেন। ক্রমশ সমুদ্রের গর্জন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র চোখে পড়ল। চুড়োয় ওঠার পর বাইনোকুলারে বাঁ দিকে কিছু দেখে কর্নেল বললেন, "ওই যে দেখছ একটা হোটেল। তুমি এখানে বসে লক্ষ রাখো। যদি দ্যাখো, শেরোয়ানিচুস্ত-টুপিপরা কোনও মুসলিম ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী বিচে নামছেন, তুমি গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ভাব জমাবে। যেভাবে হোক, কথায়-কথায় ওঁদের আটকে রাখবে। আমি সেই সুযোগে হোটেলে ঢুকে স্যুটে হানা দেব।"

কর্নেল হনহন করে সোজা এগিয়ে গেলেন। তারপর অদৃশ্য হলেন।

হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। শীতের বেলা পড়ে আসছিল। বসে আছি তো আছি। কতক্ষণ পরে দেখি, সেই মুসলিম ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী কখন আমার ঠিক নীচে বিচের ওপর চলে এসেছেন। দু'জনে বিচ ধরে দক্ষিণে এগোচ্ছেন। তবে হাঁটার গতি বেশ দ্রুত।

গতরাতে থানায় ওঁদের কথা শুনেছি। নাম দুটি মনে পড়ল। মইনুদ্দিন আমেদ এবং পিটার ন্যাজারেথ। দু'জনেই নাকি চামড়া ব্যবসায়ী। কিন্তু কর্নেলের দৃষ্টি ওঁদের ওপর পড়ল কেন?

একটু ইতস্তত করে বিচে নেমে গেলাম। ওঁরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ওদিকটা একেবারে নির্জন খাঁ-খাঁ। বাঁ দিকে সমুদ্র সামনে গজরাচ্ছে। হন্তদন্ত এগিয়ে "হ্যালো" বলে সম্ভাষণ করলাম। কিন্তু সমুদ্রের গর্জনে কথাটা হারিয়ে গেল। দুটো বালির টিলার মধ্যিখানে খাড়ির মতো একটা সঙ্কীর্ণ জায়গা দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রের জল সেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। জলটা পিছিয়ে সমুদ্রে সরে গেলে ওঁরা দু'জনে খাড়িটা পেরিয়ে ডাইনে অদৃশ্য হলেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

আবার সমুদ্রের জল এসে খাড়িতে ঢুকল। তারপর জলটা পিছিয়ে যেতেই খাড়ি পেরিয়ে গেলাম। ডাইনে ঘুরে দেখি, বালিয়াড়িতে একটা পাথরের ঘর অর্ধেকটা ডুবে আছে। ফাটলধরা পোড়ো ঘর। ছাদ ধ্বসে পড়েছে। এ-ও নিশ্চয় মুঘল আমলের কোনও বাড়ি। মইনুদ্দিন এবং ন্যাজারেথ সেখানে ঢুকে গেলেন।

সাবধানে এগিয়ে সেই ঘরের কাছে গেলাম। গুঁড়ি মেরে বসলাম। হঠাৎ একটা আর্তনাদ ভেসে এল। তারপর কেউ চিৎকার করে উঠল খ্যানখেনে গলায়, "শাট আপ।"

গুঁড়ি মেরে পাথরের চাঙড়ের আড়ালে গিয়ে উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দিনশেষের আবছা আলোয় ঘরের মেঝেতে বালিতে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রাখা হয়েছে একটা লোককে। তার হাত দুটো পিঠের দিকে বাঁধা। এবং লোকটা আর কেউ নয়, আমাদের হালদারমশাই!

ন্যাজারেথ তাঁর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে চুল খামচে ধরে আছে। মইনুদ্দিন সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে, "স্পিক দ্য ট্রুথ!"

আর সহ্য করতে পারলাম না। একলাফে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তারপর ঝাঁপ দিলাম মইনুদ্দিনের ওপর। তার টুপি খসে পড়ল। সে হুঙ্কার দিয়ে কিছু বলল। ন্যাজেরেথ অমনই বালিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। ততক্ষণে মইনুদ্দিনের সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি বেধে গেছে। তার দাড়ি খামচে ধরেছিলাম। উপড়ে এল। তখনই চিনতে পারলাম তাকে। কী আশ্চর্য, এ তো সেই রাজেন অধিকারী!

চেনামাত্র তাকে ছেড়ে ন্যাজারেথের কান ধরতে লাফ দিলাম। ন্যাজারেথ যে সেই দানো অর্থাৎ কৃত্রিম মানুষ, এ-ও মুহূর্তে বুঝে গেছি। কিন্তু তার কান মলে দেওয়ার সুযোগ পেলাম না। সে আমাকে ঠেলে বালির ওপর ফেলে দিল। রাজেন অধিকারীও আমার বুকের ওপর এসে বসল। মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

আমি তার দিকে হাত ওঠানোর সুযোগ পেলাম না। আমার দুই বাহুতে সে দুই পা চাপিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে কী একটা খুদে কালো বোতামের মতো জিনিস আমার কপালে সেঁটে দিল। মনে হল, অতল শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি।

॥ ৬ ॥

প্রথমে ভেবেছিলাম একটা বিকট দুঃস্বপ্ন দেখছি। চাঁদের আলোয় জায়গাটা মোটামুটি স্পষ্ট। আমার নিম্নাঙ্গ নিঃসাড়। ঠাণ্ডায় জমে গেছে। তারপর বুঝলাম আমার কোমর পর্যন্ত বালিতে পোঁতা এবং হাত দুটো পেছনে বাঁধা। যন্ত্রণা টের পেলাম। তখন সব কথা মনে পড়ে গেল। ডাকলাম, "হালদার-মশাই! হালদারমশাই!"

কোনার দিকে ছায়া। সেখান থেকে হালদারমশাইয়ের করুণ সাড়া এল, "আছি।"

"একটা কিছু করা দরকার, হালদারমশাই।"

হালদারমশাই রুগির গলায় অতি কষ্টে বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা পোঁতা আছি জয়ন্তবাবু। পায়ে একটুও শক্তি নাই।"

"আপনাকে কোথায় ধরেছিল?"

"সি বিচে কাইল রাত্তিরে অগো ফলো কইরা কইরা বিপদ বাধাইছি।"

এই সময় বাইরে ধুপধুপ শব্দ কানে এল। হালদারমশাই চাপা গলায় বললেন। "চুপ কইরা থাকেন। চক্ষু খুলবেন না।"

চোখ বোজার আগে দেখে নিলাম, দুটো লোক আসছে। একজনের কাঁধে মড়ার মতো কেউ ঝুলছে। তারা ঘরে ঢুকলে চিনতে পারলাম। রাজেন অধিকারী এবং তার দানো। দানোর কাঁধে আর-একজন মড়ার মতো লোক। রাজেন অধিকারী হুঙ্কার দিল তখনকার মতো। অমনই দানোটা 'মড়া' নামিয়ে বালিতে গর্ত খুঁড়তে থাকল। গর্তটা সে হাত দিয়েই খুঁড়ছিল। বুঝলাম, রাজেন অধিকারীর হুঙ্কার সম্ভবত বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের ভাষায় 'সোনিম'। বিশেষ ধ্বনিতরঙ্গের সাহায্যে হুকুম জারি।

দানোটা যাকে আমাদের মতো কোমর পর্যন্ত পুঁতে হাত দুটো পেছনে

বাঁধল, সে যে মড়া নয় তা একটু পরে বুঝলাম। রাজেন অধিকারী তাকে বলল, "হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, না বলা পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকো।"

সে হি হি করে হেসে উঠল।

"শাট আপ। পাগলামি ঘুচিয়ে দেব। বলো হিরে কোথায়?"

"বলব না!"

"না বললে দাদা বলে খাতির করব না আর।"

"ইস! আমি তোর সত্যিকার দাদা নাকি? বেশি জাঁক দেখাসনে রাজু। সব ফাঁস করে দেব। যখন বাপ-মা মরে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, তোকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছিলাম। তুই নেমকহারাম!"

"চুপ! টাম্বোকে হুকুম দিলে এখনই তোমার মুণ্ডু মুচড়ে দেবে।"

"তাই দে না। মলে তো বেঁচে যাই। ওরে হতভাগা তোর বাবার আত্মার সঙ্গে আমার সবসময় দেখা হয় জানিস! দাঁড়া! ডাকছি তাকে। "প্রমথ! প্রমথ! কাম অন! তোমার হারামজাদা পুত্রটিকে এসে শায়েস্তা করো দিকি।"

"শাট আপ! বলো হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

"হিরে তোর বাপের? নওরোজিসায়েবের সঙ্গে চক্রান্ত করে ম্যাডান-সায়েবের হিরে চুরি করেছিলি। ওই ভূতটাকে দিয়ে নওরোজিকে মারলি। শেষে ম্যাডানসায়েবকে মারলি। পাপের ভয় নেই তোর?"

রাজেন অধিকারী ফুঁসে উঠল। "তুমিও কম পাপী নও। আমার ল্যাব থেকে হিরে চুরি করে ম্যাডানসায়েবকে চিঠি লিখেছিলে এখানে আসতে। তুমি থাকো ডালে-ডালে, আমি থাকি পাতায়-পাতায়। এবার ম্যাডানসায়েবের জামাইকে হিরে ফেরত দেওয়ার চক্রান্ত করেছ। সে-খবরও আমি রাখি, যাক গে বলো—হিরে কোথায় রেখেছ?"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "বসন্তবাবু! আপনি ভুল করছেন! হিরে কলকাতায় ম্যাডানসায়েবেরে দিয়া দিলেই পারতেন। এই ট্রাবল হইত না!"

রাজেন অধিকারী ঘুরে দাঁড়াল। "তবে রে ব্যাটা টিকটিকি! বলে তেমনই হুঙ্কার দিতেই 'টাম্বো' গিয়ে হালদারমশাইয়ের চুল খামচে ধরল। হালদারমশাই আর্তনাদ করলেন।

বসন্তবাবু বললেন, "আপনি ভাল বলেছেন মশাই! কলকাতায় হিরে দিলে এই রাজু ব্যাটাচ্ছেলে ঠিক টের পেয়ে যেত। ওর যন্তরমন্তরে সব ধরা পড়ে যেত। সেজন্যেই গোপালপুরে আসতে লিখেছিলাম। আমার চেনা জায়গা। তা আপনাকে দেখছি জ্যান্তপুঁতেছে?" হিহি-হোহো করে একচোট হাসার পর বসন্তবাবু এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেলেন। বললেন, "মলো ছ্যাই। এ আবার কে? ও রাজু! একে কেন পুঁতলি?"

রাজেন অধিকারী তেড়ে এল। "চুপ! এই শেষবারের মতো বলছি, বলো হিরে কোথায়?"

বসন্তবাবু ভেংচি কেটে বললেন, "তোর বাপের হিরে? দাঁড়া তোর বাপের আত্মাকে ডাকি: সে নিজে এসে বলুক, হীরে কার?" বলে ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন, "রাতবিরেতে তোর বাপ পাখি হয়ে সমুদ্রের ওপর চক্কর দিয়ে বেড়ায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তা জানিস?"

রাজেন অধিকারী বলল, "তা হলে মরো! টাম্বো! টাম্বো! টাম্বো!"

তার হাতে টর্চের মতো একটা জিনিস থেকে নীলচে আলো জ্বলে উঠল। তারপর যা দেখলাম, শিউরে উঠলাম। দানোটা হালদারমশাইয়ের চুল ছেড়ে দিয়ে বসন্তবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে কী একটা বের করল। সেটা আর কিছু নয়, একটা কালো রঙের ছোট্ট সাপ। সাপটার লিকলিকে জিভ। বসন্তবাবুর মুখের কাছাকাছি সে সাপটাকে নিয়ে গেল। বসন্তবাবু আর্তনাদ করলেন, "প্রমথ! প্রমথ! বাঁচাও!"

তিনি সম্ভবত রাজেন অধিকারীর বাবার প্রেতাত্মাকে ডাকার জন্য সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরালেন। তারপরই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই সে আসছে! ওই দ্যাখ রাজু। পাখি হয়ে তোর বাপ উড়ে আসছে।"

অতিকষ্টে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, কী অদ্ভুত। সমুদ্রের আকাশে বিশাল লম্বা ডানাওলা একটা পাখি উড়ে আসছে এই বালিয়াড়ির দিকে।

রাজেন অধিকারী পাখিটাকে দেখা মাত্র হুঙ্কার দিল। তখন দানোটা এক লাফে বাইরে চলে গেল। নীলচে আলোটা নিভিয়ে রাজেন অধিকারীও বেরোল। বাইরে এক পলকের জন্য চোখ ঝলসানো আলো দেখলাম। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, কেউ রাজেন অধিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর ধস্তাধস্তি, হাঁকডাক, বালিতে ধুপধুপ শব্দ। জ্যোৎস্নায় অনেক ছায়ামূর্তির ছুটোছুটি।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বলে উঠলেন, "খাইছে!"

সেই সময় বাইরে কর্নেলের সাড়া পেলাম। "জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

চেঁচিয়ে বললাম, "এখানে! এখানে!"

টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর কর্নেলকে দেখতে পেলাম। বললেন, "কী সর্বনাশ! হালদারমশাইকেও পুঁতেছে দেখছি।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "হঃ!"

কয়েকজন পুলিশ ঘরে ঢুকে বাঁধন খুলে দিয়ে বালি সরিয়ে আমাদের ওঠাল। আমি পা ছড়িয়ে বসলাম। হালদারমশাই কিন্তু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পা ছোঁড়াছুড়ি করে বললেন, "আই অ্যাম অলরাইট। বাট হেভি ক্ষুধা পাইছে।"

বসন্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাই। প্রমথের আত্মাকে দেখা করে আসি।"

কর্নেল বললেন, "বসন্তবাবু! প্রমথ কে?"

"ওই শয়তানটা রাজুর বাবা বড্ড ভাল লোক ছিল মশাই। না, না! যাই দেখা করে আসি। পর-পর দু'বার পাখি হয়ে উড়ে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

বসন্তবাবু বেরিয়ে গেলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। পা বাড়াতে গেছি, হঠাৎ পায়ের কাছে কর্নেলের টর্চের আলোয় সেই সাপটাকে দেখতে পেলাম। চমকে উঠে সরে গেলাম। কর্নেল সাপটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "এ-ও কিন্তু কৃত্রিম সাপ জয়ন্ত! তবে টাম্বোর মতো নয়। জেনোম থিওরির সঙ্গে এটার সম্পর্ক নেই। এটা নেহাত খেলনা সাপ। চলো, বেরনো যাক।"

বাইরে গিয়ে দেখি, পুলিশের দঙ্গল ছায়ামূর্তির মতো বিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সি আই ডি অফিসার সুরঞ্জনবাবু বেরিয়ে এলেন। বললেন, "সায়েন্টিস্ট ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম কর্নেল। দিনে-দিনে পৃথিবীটা ওঁরা একেবারে অন্যরকম করে দিচ্ছেন। মাথা ঠিক রাখা কঠিন।"

কর্নেল বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবুর চেয়ে সেরা বিজ্ঞানী এখন আপনাদের হাতে মিঃ দাস! শিগগির গিয়ে ওঁকে আর্মির কর্নেল সিংহের জিম্মায় রাখার ব্যবস্থা করুন। কিছু বলা যায় না। পুলিশের হাজত ওকে আটকে রাখার মতো শক্ত জায়গা নয়। রাজেন অধিকারী এ-যুগের এক জাদুকর বিজ্ঞানী।"

সুরঞ্জনবাবু হন্তদন্ত চলে গেলেন। আমরা সামনে বালির টিলার দিকে যাচ্ছিলাম। টিলার মাথায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে। কর্নেল ডাকলেন, "বসন্তবাবু!"

কোনও সাড়া এল না। কাছে গিয়ে আবার কর্নেল বললেন, "বসন্তবাবু। দেখা হল প্রমথবাবুর আত্মার সঙ্গে?"

বসন্তবাবু গলার ভেতর বললেন, "নাহ। দেরি দেখে প্রমথ উড়ে গেল। ওই দেখুন যাচ্ছে।"

জ্যোৎস্নার সমুদ্রের আকাশে সেই বিশাল পাখিটাকে ক্রমশ দূরে কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে দেখলাম। হালদারমশাই চমকানো গলায় বলে উঠলেন, "কী? কী?"

কর্নেল হাসলেন। "পাখি নয়, হালদারমশাই। হ্যাং গ্লাইডার।"

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের যে একটা হ্যাং

গ্লাইডার আছে। কী ভুলো মন আমার। বললাম, "কর্নেল, তা হলে মারিয়াম্মা যে ভুতুড়ে পাখির কথা বলছিল—"

আমার কথার ওপর কর্নেল বললেন, "ডার্লিং। তুমি সবই বোঝো। তবে দেরিতে। চন্দ্রকান্তবাবু কলকাতা থেকে হ্যাং গ্লাইডারে চেপে এসেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন।"

বসন্তবাবু পা বাড়িয়ে বললেন, "যাই। ম্যাডানসায়েবের জামাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে ওর শ্বশুরের হিরে ফেরত দিই গে।"

কর্নেল বললেন, "হিরে উনি ফেরত পেয়েছেন বসন্তবাবু।"

"কী বললেন?" বসন্তবাবু হি-হি হো-হো করে বেজায় হাসতে লাগলেন। "হিরে ফেরত পেয়েছে? কী করে পাবে মশাই? এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, কার সাধ্যি খুঁজে বের করে?"

"যাকে আপনি প্রমথবাবুর আত্মা বললেন, তিনিই খুঁজে বের করেছেন। ব্যাকওয়াটারের ওখানে একটা মন্দিরের ভেতর আপনি পুঁতে রেখেছিলেন। কালো রঙের একটা ছোট্ট কৌটোতে। তাই না?"

"সর্বনাশ।" বলে বসন্তবাবু দৌড়ে বিচে নামতে থাকলেন।

কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, "বরং ম্যাডানসায়েবের জামাই যে-বাংলোতে উঠেছেন, সেখানে চলে যান বসন্তবাবু।"

হালদারমশাই এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "এখানে থাকা ঠিক না, কর্নেল সার। হেভি ক্ষুধা পাইছে। তাছাড়া আমার সন্দেহ হয়, রাজেন অধিকারীর ভুতটা কোথাও ঘাপটি পাইত্যা-বইয়্যা রইছে। পুলিশ আর ধরতে পারে নাই।"

"টাম্বোকে চন্দ্রকান্তবাবু লেজার পিস্তলের একটা শটেই ছাই করে দিয়েছেন হালদারমশাই।"

"অ্যাঁ? কই? কই?"

"কাল সকালে এসে দেখবেন। চলুন, এবার ফেরা যাক।"

কর্নেল আমাদের সোজা নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের সেই বাংলোতে। কুসরো অপেক্ষা করছিলেন কর্নেলের জন্য। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, বসন্তবাবু খুশি-খুশি মুখে বসে পা দোলাচ্ছেন এবং মিটিমিটি হাসছেন। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল। ডিনার টেবিলে বসে হালদারমশাই খাদ্যে মন দিলেন। কর্নেল বললেন, "বসন্তবাবু আমাদের গতরাতে ঢিল ছুঁড়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন কেন বলুন তো?"

বসন্তবাবু মুরগির ঠ্যাং কামড়ে ধরে বললেন, "ঢিল নয়। ছোট-ছোট বালির গোটা।"

"কিন্তু কেন?"

"আপনারা আমার কাজে বাগড়া দেবেন ভেবেছিলাম। বুঝলেন না? পুলিশ এতে নাক গলাক, এটা আমার পছন্দ নয়। পুলিশ যদি জানতে পারত, আমার কাছে হিরে আছে, কেলেঙ্কারি হত না? আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পিটিয়ে কথা বের করে ছাড়ত। ওরে বাবা! আমি পুলিশ দেখলেই কেটে পড়ি।"

"আর-একটা কথা বসন্তবাবু!"

"বলুন। আমার মন খুব ভাল হয়ে গেছে। সব কথার জবাব দেব।"

"আপনি হিরের কথা কী জানতে পেরেছিলেন?"

"রাজুর কাছে প্রায়ই একটা লোক আসত। দু'জনে চুপিচুপি কথা হত। আড়াল থেকে শুনতাম। পরে বুঝলাম, কী সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে। লোকটা নাকি আমেরিকার কোনও সায়েবের কাছে জানতে পেরেছে, কুসরো-সায়েবের শ্বশুর কোনও সম্রাটের হিরে কিনেছেন। সেই হিরে চুরির মতলব করেছে ওরা। কী যেন নাম লোকটার? নও···নও···দুচ্ছাই!"

কুসরো বললেন, "নওরোজিসায়েবের কিউরিও শপ আছে। বিদেশে তার অনেক চর আছে। তাদেরই কেউ খবরটা দিয়ে থাকবে—ভদ্রলোক আমার শ্বশুরের চেনা লোক ছিলেন। এদিকে আমার শ্বশুরও তত চতুর মানুষ ছিলেন না। মনে হচ্ছে, কোনও কথায় মুখ ফসকে হিরের কথা তিনিও বলে থাকবেন। এমনকী, হিরেটা দেখিয়েও থাকবেন।"

বললাম, "নওরোজির সঙ্গে কীভাবে রাজেনবাবুর পরিচয় হল?"

কর্নেল বললেন, "নওরোজির এক ভাই আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিক্সের অধ্যাপক। সেখানেই রাজেনবাবু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। গত মাসে সেই অধ্যাপক কলকাতা এসেছিলেন। নওরোজি সেই উপলক্ষে পার্টি দেন। রাজেনবাবুও পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এসব খবর নিয়ে তবে গোপালপুরে ছুটে এসেছিলাম।

বসন্তবাবু বললেন, "রাজু বরাবর এইরকম স্বার্থপর।

কর্নেল বললেন, "নওরোজি নিশ্চয় জানতেন না, টাম্বো কৃত্রিম মানুষ। টাম্বোকে তাহলে গুলি করতেন না।"

বসন্তবাবু বললেন, "শয়তান রাজু নও···নও, দুচ্ছাই! রাজু সেই লোকটাকে একদিন বলেছিল, হিরে চুরি গেছে। কে চুরি করেছে? না—ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওই ভূতটা। কাজেই মারো গুলি! দে বডি ফেলে। হি হি হি হি। বডি ফেলতে গিয়ে নিজেরই বডি পড়ে গেল। হো হো হো হো···"।

হালদারমশাই এতক্ষণে বললেন, "হঃ। বডি পড়া স্বচক্ষে দেখছিলাম। সে কী পড়া।"

কর্নেল বললেন, "আপনার বডিও পড়ে যেত। জোর বেঁচে গেছেন।"

"হঃ।" বলে হালদারমশাই জলের গ্লাস তুলে নিলেন।

রামশংকরের
ছায়া

কলকাতা থেকে যাত্রা করার আগেই খবরটা পড়া ছিল। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের এক দুঃসাহসী বিমান শিক্ষার্থী ইন্দ্রনীল রায়ের গ্লাইডারে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা একটানা উড়ে পেঁছানো অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

বিদেশে হ্যাং গ্লাইডারে ওড়াউড়ি এখন রীতিমতো স্পোর্টস। বিশ থেকে তিরিশ ফুট পর্যন্ত একটা করে লম্বাটে ডানা—কতকটা দেখতে গঙ্গাফড়িংয়ের মতো। প্যারাশুট কাপড়ে তৈরি। মধ্যখানে হাল্কা ধাতুর রড দিয়ে তৈরি একটা সামান্য ফ্রেম। সেটা আঁকড়ে একটানা অতখানি দূরত্ব অতিক্রম করা কি সম্ভব? পথে বেশ কয়েকটা বায়ুস্রোত আড়াআড়ি পেরুতে হবে। তার ওপর ওই বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী। গ্লাইডার তত বেশি উঁচুতে উড়তেও পারে না। অবশ্য ইন্দ্রনীল তাঁর গ্লাইডারে একটা ছোট্ট ইঞ্জিন ও কন্ট্রোল ব্যবস্থা ফিট করে নিয়েছেন।

তাহলেও এপর্যন্ত বিশ্বরেকর্ড বলতে ইংলিশ চ্যানেল আকাশপথে হ্যাং গ্লাইডারে পেরুনোর কীর্তি রবিনসন গ্রিফিথের। কিন্তু এই বাঙালী যুবকটি যা করতে গেলেন, সেটা যেন আত্মহত্যার ব্যাপার। কয়েক হাজার মাইলের দূরত্ব যে!

রাজস্থানের জয়পুর থেকে যোধপুরে ট্রেনে আসার পথে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পাতায় আবার ইন্দ্রনীলের খবর পড়ে চমকে উঠলুম। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম, তাই ঘটেছে। ইন্দ্রনীল তাঁর গ্লাইডার সহ নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর হলুদ রঙের গ্লাইডার শেষ দেখা গেছে পাঞ্জাবের দক্ষিণ সীমানায় ভাতিণ্ডার কাছে বিমানবাহিনীর অভজারভেটারি থেকে।

খবরটার দিকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। উনি চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ট্রেনের জানলা দিয়ে মরু অঞ্চলের পাখপাখালি খুঁজছিলেন সম্ভবত। শুধু বললেন—তাই নাকি? তারপর আবার বাইনোকুলারে চোখ দিলেন। মাঝে মাঝে অভ্যাস মতো একরাশ সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে ভুললেন না।

আমাদের—ঠিক আমার নয়, কর্নেলের গন্তব্য বারমের স্টেশনে নেমে জালোরের পথে লুনি নদীর তীরে একটি গ্রাম সিহোরা। বরাবরের মতো এবারও আমি তাঁর সঙ্গী। ভারত সরকারের লোকাস্ট কন্ট্রোল বোর্ড অর্থাৎ পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাঁকে পঙ্গপালের প্রজননক্ষেত্রে সন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় আর উদ্ভিদের রহস্য নিয়ে ক্রমশ যেভাবে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মেতে উঠেছেন, আমার কেমন একটা অস্বস্তি হয় আজকাল।

ওঁর কাছেই জেনেছি, পরিযায়ী বা মাইগ্রেটরি পাখিদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে মরশুমী অভিযাত্রার মতো পঙ্গপালের ঝাঁকেরও নাকি একই স্বভাব। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি থেকে শরৎকালের শেষে ওরা আকাশ কালো করে উড়ে আসে। পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতের রাজস্থান মরু অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ওরা আসে প্রজননক্ষেত্রের খোঁজে। সেখানে ডিম পাড়বে। ছানা পোনাগুলো পনের দিনের মধ্যেই লায়েক হয়ে যাবে। তখন খারিফ শস্যের মরশুম। শস্যের ক্ষেতে গিয়ে হানা দেবে। আকাশ কালো হয়ে যাবে। শস্যের ক্ষেত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শূন্য করে চলে যাবে অন্য এলাকায়। হেলিকপ্টারে করে বিষ স্প্রে করেও ওদের সংখ্যা কমানো যায় না। নিরক্ষর গ্রামের মানুষ পুজো দিয়ে দেবতার কাছে মাথা ভাঙে। আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে এবং অনেকে ঢাকঢোল কাঁসি ক্যানেস্তোরা পিটিয়ে শোরগোল তুলেও পঙ্গপালের ঝাঁক তাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরিণামে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়।

পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বারমেরায় একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখানে পঙ্গপাল নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশেষে সুপারিশ করেছেন, ওদের প্রজননক্ষেত্রটি খুঁজে যদি যথাসময়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলে উৎপাত ক্রমশ বন্ধ হবে। বয়স্ক পঙ্গপালেরা ডিম পেড়েই অথর্ব হয়ে ক্রমশ সেখানেই মারা যায়। কাজেই ওদের ব্রিডিং ফিল্ডটি খোঁজা দরকার।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। রাজস্থানের বিশাল থর মরুভূমি এখনও দুর্গম। সারা রাজস্থানের বসতি এবং পাহাড় এলাকাতেও কোথাও ব্রিডিং ফিল্ডের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায়নি। লুনি নদীর অববাহিকায় গতবছর একটি ব্রিডিং ফিল্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল। কর্নেল প্রথমে সেখানেই যেতে চান। তাঁর গোয়েন্দাস্বভাব অনুসারে সেখান থেকে সূত্র ধরে এগোতে চান।

যোধপুরে আমাদের জন্য জিপ অপেক্ষা করছিল। ঊষর ধূ-ধূ মাটি আর ন্যাড়া টিলাপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে বালিয়াড়িও চোখে পড়ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের বিকেল। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটানিতেও বেশ শীত করছিল। বারমেরা পেঁছুতে রাত আটটা বেজে গেল।

গবেষণাকেন্দ্রের অতিথিভবনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে এবার যাত্রা শুরু হল উটের পিঠে। আর গাড়ি চলার রাস্তা নেই। সাতটা উটের পিঠে। কর্নেল, আমি গবেষণাকেন্দ্রের দুই বিজ্ঞানী বিনায়ক শর্মা ও রাজকুমার রাণা, তাঁবু এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। দুটো বাড়তি উট নেওয়া হয়েছে সঙ্গে, যদি কোনো উট অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য।

পাথুরে মাঠে, বালিয়াড়ি, মাঝেমাঝে ন্যাড়া পাহাড়, কাঁটাগুল্ম বা কদাচিৎ বাবলাজাতীয় গাছ—সারাপথ এই একঘেয়ে দৃশ্য। কোথাও ছাগল ও ভেড়ার

পাল চরাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা। ওরা যাযাবর। লুনি নদীর যত কাছাকাছি যাচ্ছি, তত কিছু গাছপালা, টুকরো সবুজ তৃণাঞ্চল চোখে পড়ছে।

তিরিশ মাইল উত্তর-পূর্বে এগিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা সিহোরা পৌঁছলুম। রুক্ষ লালপাথরের টিলার ধারে একটা ছোট্ট গ্রাম। অধিবাসীরা ভীষণ গরিব। পশুপালনই ওদের জীবিকা। একটু দূরে লুনি নদীর চেহারা দেখে হতাশ হলুম। বালি আর পাথরে ভর্তি নদীর খাত। একফাঁকে সামান্য একফালি স্রোত এখনও তিরতির করে বইছে। মার্চেই নাকি তা শুকিয়ে যাবে। তখন সিহোরার একটিমাত্র কুয়োর জলও যাবে শুকিয়ে। নদীর বালিতে গর্ত করে যেটুকু জল জমবে, গ্রামের ক্ষেত এবং তাদের পালিত পশুর দল তাই ভরসা করে বর্ষা পর্যন্ত কাটিয়ে দেবে। এমন ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রা এখানে!

কুয়োর কাছাকাছি রুক্ষ পাথুরে মাটির ওপর আমাদের ছটা তাঁবু খাটানো হল। এক সপ্তাহের খাদ্যদ্রব্য, কয়েক রকমের যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য পেস্টিসাইডসের স্টক তিনটে তাঁবুতে ঢোকানো হল। একটা তাঁবুতে কর্নেল ও আমি, অন্যটায় বিনায়ক ও রাজকুমার, বাকি তাঁবুতে গবেষণাকেন্দ্রের দুজন কর্মী। উটচালক রক্ষীরা থাকবে খোলা আকাশের নিচে। ওরা বারমের অঞ্চলেরই লোক।

সূর্য অস্ত গেল সিহোরার পেছনে লাল পাথরের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে। কর্নেল কফি খেয়ে চুরুট ধরিয়ে বললেন—এস ডার্লিং! ওঁরা দেখছি খুব ক্লান্ত হয়ে জিরোচ্ছেন। ওঁদের আর ডেকে কাজ নেই। নদীটা একবার দর্শন করে আসি।

বিনায়ক শর্মার বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। রোগা লম্বাটে গড়নের মানুষ। রাজকুমার আমারই বয়সী যুবক। বেশ স্বাস্থ্যবান সুদর্শন। অভিজাত রাণাবংশের ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। রাজকুমার বলল—কর্নেল, কোথায় যাচ্ছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—লুনিদর্শনে, তুমি ক্লান্ত বলে ভাবছিলুম ডাকব না। বিশ্রাম নাও।

—কী যে বলেন! বলে রাজকুমার উঠে এল। উঠের পিঠে আমার জন্ম বলতে পারেন।

বিনায়ক বললেন—আপনারা নদীতে যাচ্ছেন? ঠিক আছে। কিন্তু ওপারে যাবেন না—সন্ধ্যার মুখে ওপারে যাওয়াটা ঠিক নয়।

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন—কেন বলুন তো?

—রাজকুমার জানে। বলবে আপনাকে। বলে বিনায়ক শর্মা ওরফে শর্মাজী ক্যাম্পচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে দুলতে শুরু করলেন।

পা বাড়িয়ে রাজকুমার হাসতে হাসতে চাপা গলায় বললেন—শর্মাখুড়োকে দেখছেন। উনি বিজ্ঞানী হলে কী হবে? কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ। কবে

এখানে এসে শুনে গেছেন, লুনি নদীর ওপারে ভূতের রাজত্ব।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে ওপারটা দেখতে দেখতে বললেন—ওটা কি কোনো কেল্লা নাকি রাজকুমার?

রাজকুমার বলল—হ্যাঁ। ব্রিটিশ যুগে এই এলাকা ছিল আমার দাদু রাণা উদয়ভানুজীর রাজ্য। করদ রাজ্য আর কী! ওই কেল্লাটা আমাদেরই পূর্ব-পুরুষের। কয়েক পুরুষ আগেই ভেঙেচুরে গেছে। বালির ভেতর অনেকটা ঢাকা পড়েছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর বালিতে নেমে গেলুম। অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। তার ওধারে গিয়ে দেখি একজন লোক একপাল ছাগলকে জল খাওয়াচ্ছে। আমাদের দেখে সে খুব অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। জলটায় জুতোর তলা পর্যন্ত ডোবে না। পেরিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন সে আমাদের ডাকল—শুনিয়ে শুনিয়ে!

আমরা ঘুরে দাঁড়ালুম। কর্নেল বললেন—কিছু বলছ ভাই?

লোকটা বলল—সায়েব! আপনারা এখন ওপারে যাবেন না। একটু আগে আমি কেল্লার ওপাশে কাঁটার জঙ্গলে ছাগল চরাতে চরাতে হলদেরঙের একটা দানো দেখতে পেয়ে পালিয়ে এসেছি। দানোটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই আমাকে দেখতে পায়নি। নৈলে বচ্চন সিংয়ের দশা হত আমার!

কর্নেল হাসি চেপে বললেন—কী দশা হয়েছিল বচ্চন সিংয়ের?

—সে খুব ভয়ংকর ঘটনা সায়েব! লোকটা চোখ বড় করে বললো—বচ্চন তো বটেই, তার তিরিশটা ছাগলও মারা পড়েছিল দানোটার নিঃশ্বাসের বিষে। আর সায়েব, দানোর নিঃশ্বাস মানে কী? প্রচণ্ড গরম ঝড়। সিহোরাতক এসে ধাক্কা মেরেছিল! সব বাড়ি উড়ে গিয়েছিল। আর সে কী তাপ! খরার সময় দুপুরবেলাতেও এমন তাপ দেখা যায় না!

রাজকুমার বলল—যত্তোসব! এ অঞ্চলে এরকম আকস্মিক ঘূর্ণিঝড় কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। আবহবিজ্ঞান সম্পর্কেও আমার কিছু জানাশোনা আছে। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পঞ্চাশ-ষাট মাইল গেলেই কচ্ছের রান অঞ্চল শুরু। ওখানে লুনি নদী মিশেছে জলাভূমিতে। জলাভূমির সঙ্গে আরবসাগরের যোগাযোগ আছে। মধ্য রাজস্থানের মরুতে প্রচণ্ড তাপের ফলে যখন বাতাস হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে যায়, তখন সেই ফাঁক পূরণ করার জন্য আরবসাগর থেকে কচ্ছ পেরিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাতাস ছুটে আসে। ভূপৃষ্ঠে তাপের হেরফেরের জন্য ঝড়টা কয়েকটা কেন্দ্রে বৃত্ত হয়ে ওঠে। সেগুলোকে বলব একেকটা ঘূর্ণাবর্ত।

কথা বলতে বলতে আমরা পাথরের ওপর দিয়ে ওপারে পৌঁছে গেছি। তখনও দিনের শেষ আলো লালচে রঙে ছড়িয়ে আছে আদিগন্ত। বাঁদিকে

উত্তরে বহুদূরে বালিয়াড়ি, সমুদ্রের মতো ঢেউখেলানো অবস্থায় চলে গেছে। ডানদিকে পাথুরে লাল মাটির প্রান্তর এবং কাঁটাগুল্মের জঙ্গল— তারপর পাহাড়। পূর্বে কেল্লার ওদিকে ন্যাড়া চটান জমি পাথরে ভর্তি—বহুদূর বিস্তৃত।

কর্নেল বাইনোকুলারে ওদিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—সর্বনাশ! সত্যিই তো একটা হলুদ দানো দেখতে পাচ্ছি!

প্রথমে রাজকুমার, তারপর আমি বাইনোকুলারটা নিয়ে জিনিসটা দেখলুম। কিছু বুঝতে পারলুম না। পাথরের আড়ালে লম্বাটে হলুদ রঙের একটা জিনিস সত্যি দেখা যাচ্ছে। কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, এস তো। দেখি।

কেল্লা বাঁদিকে রেখে কিছুদূর এগিয়ে আমার মাথার ভেতর কী একটা ঝিলিক দিল। বললুম— কর্নেল! ওটা সেই ইন্দ্রনীল রায়ের গ্লাইডার নয় তো? ইন্দ্রনীল গ্লাইডারসহ নিখোঁজ হয়েছে বলে কাগজে পড়ছিলুম না?

কর্নেল হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ এমন হাঁটতে পারেন ভাবা যায় না! কাছাকাছি গিয়েই বলে উঠলেন— হ্যাঁ জয়ন্ত! হ্যাং গ্লাইডার!

গ্লাইডার পড়ে আছে পরিষ্কার জমিতে। সেখানে কোনো পাথর বা কাঁটা গুল্ম নেই। মাটিটাও বালি থাকায় যথেষ্ট নরম। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, গ্লাইডারটার একটুও ক্ষতি হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে, যেন ইন্দ্রনীল এখানে ইচ্ছে করেই আস্তেসুস্থে নেমেছে। দুজনের মধ্যিখানে এনামেল রঙের ফ্রেমে কোনো-রকমে বসার মত ছোট্ট একটুখানি আসন এবং তার তলায় ইঞ্জিন ও কন্ট্রোল বক্স অটুট আছে। কিন্তু তাহলে ইন্দ্রনীল কোথায় গেল?

কর্নেল বালিমাটিতে পায়ের চিহ্ন খুঁজছিলেন। আমরাও খুঁজতে শুরু করলুম। রাজকুমার তো অনেকটা চক্কর মেরে এল। এসে বলল— আশ্চর্য তো! কোথাও পায়ের ছাপ নেই। তাহলে কি ভদ্রলোক আকাশে ভেসে থাকার সময়ই দৈবাৎ কোথাও পড়ে গেছেন—তারপর গ্লাইডারটা এসে পড়ে গেছে?

বললুম—পড়লে তো ভেঙে-চুরে যেত!

—হুঁ, তা ঠিক। রাজকুমার উদ্বিগ্নমুখে কর্নেলের দিকে তাকাল।

কর্নেল তখনও মাটিতে চোখ রেখে ঘুরছেন। হঠাৎ একখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কোটের পকেট থেকে আতস কাচ বের করলেন। ওটা কি পকেটে নিয়েই ঘোরেন সবসময়?

আলো কমে এসেছে। এত কম আলোয় কী সব দেখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে কে জানে! একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাটির ওপর সূক্ষ্ম টানা-টানা অনেকগুলো আঁচড় দেখলুম।

বললুম—মাকড়সার চলাফেরার দাগ তাহলে।

রাজকুমার বললেন—ঠিক বলেছেন। মরু মাকড়সাগুলো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হয়। ঠ্যাংগুলো অন্তত ফুটখানেক করে লম্বা।

কর্নেল আবার বাইনোকুলারে চারদিক দেখছেন। আমি আর রাজকুমার দুঃসাহসী অভিযাত্রী ইন্দ্রনীলের অন্তর্ধানরহস্য নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু করলুম। গ্লাইডার থেকে নেমে কোথায় যেতে পারে সে? কাছাকাছি বসতি বলতে সিহোরা। অন্যদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আর জনবসতি নেই। তাহলে?

দিনের শেষ আলো থেকে লালচে রঙটা মুছে গেছে। ধূসর হয়ে গেছে আলো। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কর্নেল বললেন—গ্লাইডারটা এখানে যেমন আছে থাক। রাতেই বরং আমরা রেডিও-মেসেজ পাঠিয়ে খবরটা জানিয়ে দেব পুলিশ স্টেশনে। চলো এবার কেল্লাটা একটু দেখে যাই ফেরার পথে।···

এ কিসের ডিম?

রাণা ভানুপ্রতাপের তৈরি লাল পাথরের কেল্লাটার দক্ষিণ অংশ সম্পূর্ণ বালিতে ডুবে গেছে। উত্তর অংশটা ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ফটক মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাথর ডিঙিয়ে ঘোরালো ফুট পনের চওড়া পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। পথটা পাথরের ইটে বাঁধানো। ভেঙে চুরে গেছে। বালি ঢুকছে ফাটলে। কর্নেল টর্চ বের করে বললেন—ভেবো না ডার্লিং! ফেরার সময় যাতে ঠ্যাং না ভাঙে, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা আছে!

আমার বৃদ্ধ বন্ধু যেন চলমান গেরস্থালি। ওপরে কেল্লার চত্বরে পৌঁছে সারবন্দী ঘর দেখা গেল। কোনোটারই কপাট জানালা বলতে কিছু নেই। কবে কারা খুলে নিয়ে গেছে—হয়তো সিহোরার বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরাই। প্রাকারের ধারে গিয়ে কর্নেল বাইনোকুলার দিয়ে আবার দেখতে শুরু করলেন। আমি কল্পনা করছিলুম, একদা এই প্রাকারে সশস্ত্র প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াত—কেল্লার ভেতর কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাস করতেন রাণা ভানুপ্রতাপ। রাজকুমার আমার মনোভাব আঁচ করে সেইসব গল্প শোনাতে থাকল। মোগলদের অত্যাচারেই রাণা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আলোর ধূসরতা এখন ক্রমশ কালো রঙে পরিণত হচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন— আচ্ছা রাজকুমার, ওদিকে কিছুদূরে একটা স্তম্ভ দেখলুম বালিতে মাথা উঁচু করে আছে। ওটা কিসের?

রাজকুমার বললেন শুনেছি ওটা ছিল একটা অবজারভেটরি। রাণা ভানুপ্রতাপের জ্যোতিষী শিবশংকর রাওজী গ্রহনক্ষত্র দেখতেন। ওটা পঞ্চাশ-ফুট উঁচু টাওয়ারের টুকরো বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে অবজারভেটরি।

সেদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কী একটা ঝিকমিক করে উঠল। বললুম—

কর্নেল ! ও কিসের আলো ?

কর্নেলের চোখ পড়েছিল আমার বলার আগেই। বললেন—প্রথমে ভাবলুম বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে বুঝি ! কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। তাছাড়া স্তম্ভটার কাছে বালির ওপর বিদ্যুতের ঝিলিক ! আরে ! লক্ষ্য করছ ? রঙ বদলাচ্ছে যেন মুহুর্মুহু !

হ্যাঁ—সূক্ষ্ম আলোর ঝিলিকটা নীল সবুজ লাল হলুদ শাদা হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। রাজকুমার হতবাক হয়ে দেখছিলেন। বললেন—আশ্চর্য তো ! এমন কোন ব্যাপার সিহোরার লোকে দেখে থাকলে নিশ্চয় জানতে পারতুম ! ওটা কী হতে পারে, বলুন তো কর্নেল ?

কর্নেল বললেন কিছু বুঝতে পারছি না। চলো তো দেখে আসি।

টর্চের আলো ফেলে উনি আগে, আমরা দুজনে পেছনে এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা দিয়ে কেল্লা থেকে নেমে গেলুম। ভাঙা ফটকের পাথরগুলো ডিঙিয়ে চলতে চলতে রাজকুমার বলল—কর্নেল ! শুনেছি এই কেল্লায় গুপ্তধন ছিল। রাণা ভানুপ্রতাপের কোনো দামী রত্ন ওখানে পড়ে নেই তো ? হয়তো কোন যুগে কারা গুপ্তধন আবিষ্কার করে নিয়ে পালাচ্ছিল। সেই সময় ওখানে কীভাবে একটা রত্ন পড়ে গিয়েছিল। বাতাসের দাপটে এতদিনে বালি সরে গিয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে ?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—তুমি যে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তাতে সন্দেহ নেই রাজকুমার। বিজ্ঞানীদের কাছে সবসময় সব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাই আশা করব। ডঃ শর্মা হলে হয়তো ব্যাপারটা ভুতুড়ে বলেই ব্যাখ্যা করতেন। অথচ উনি একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী। আসার পথেও আমাকে বলেছিলেন, সিহোরা এলাকায় নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত ফেনোমেনা দেখা যায়। ওঁর বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলো বোঝা সম্ভব নয়। কারণ--

হঠাৎ উনি থেমে গেলেন। আমরাও থমকে দাঁড়ালুম। রঙবেরঙের আলোর ঝিলিক আর দেখা যাচ্ছে না।

কর্নেল কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন—কী কাণ্ড ! এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অথচ আর একটু এগোলে আর দেখা যাচ্ছে না, তার মানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে চোখের রেটিনায় ওই বিচ্ছুরণটা ক্রিয়াশীল। ভাববার কথা। এক কাজ করা যাক। রাজকুমার। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আর জয়ন্ত এগিয়ে যাই ; তুমি চেঁচিয়ে বলে দেবে ঠিক জায়গায় যাচ্ছি কি না।

রাজকুমার দাঁড়িয়ে রইল। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলুম। রাজকুমার চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতে থাকল ডাইনে—এবার সোজা ! হ্যাঁ, এগিয়ে যান। বাঁদিকে। না—একটু ডাইনে। হ্যাঁ—এবার সোজা। ঠিক আছে।···

টর্চের আলোয় পাথরের কারুকার্যখচিত ফুট পাঁচেক উঁচু স্তম্ভের পাশে

বালির ভেতর একটা সাদা জিনিস চকচক করছিল। বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড ডিম্বাকৃতি সাদা জিনিস। কর্নেল বললেন—দুহাতে তুলে দেখ ওঠাতে পারছ নাকি।

জিনিসটা তত কিছু ভারী নয়। সহজে দুহাতে তুলে ধরলুম। কর্নেল টোকা দিয়ে দেখে হাসতে হাসতে বললেন—এ কোন পাখির ডিম জয়ন্ত? আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের দেখা সেই রক পাখির ডিম? যদি এটা সত্যি ডিম হয়, তাহলে পাখিটার গড়ন কল্পনা করো তো!

বললুম—পাখিটা হবে অন্তত একটা ডাকোটা প্লেনের মতো। কিন্তু এটা থেকেই যে আলো ঠিকরোচ্ছে, তার প্রমাণ?

কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন—রাজকুমার! জিনিসটা কি দেখতে পাচ্ছ?

রাজকুমার সাড়া দিয়ে বলল—পাচ্ছি। উঁচুতে উঠে গেছে।

আমি অতিকায় ডিমটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অতএব এটাই সেই রশ্মি বিকিরণকারী জিনিসটা। কর্নেল বললেন—চলো ডার্লিং! তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। শর্মাজী প্রাণিবিজ্ঞানী। নিশ্চয় তিনি একটা কিছু হদিস দিতে পারবেন।

ডিম হোক, যাই হোক, জিনিসটার তাপ আছে। মরুভূমির শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় আমাকে আরাম দিচ্ছিল যথেষ্ট।...

মাস্টার ব্লিকের জন্ম

প্রাথমিক পরীক্ষা করে শর্মাজী আমাদের চমকে দিয়ে বলেছেন, ডিম্বাকৃতি বস্তুটির বহিরাবরণ সিলিকন ধাতুতে তৈরি। প্রকৃতিতে এভাবে সিলিকন পাওয়া যায় না। অতএব এটি মানুষেরই তৈরি কোনো যন্ত্র।

কিন্তু কী যন্ত্র? আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। সূর্যোদয়ের পর ওটা তাপনিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে তাপ বাড়তে থাকে। মধ্যরাতে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পেঁছায়। তারপর আবার কমতে কমতে ভোরবেলা ২৪ ডিগ্রি সেঃ এবং সূর্য ওঠার পর ক্রমশ তাপ ও শীতলতার মাঝামাঝি অবস্থা। রামধনুরশ্মি বিকীরণ করে সূর্যাস্তকাল থেকেই এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে তা চোখে পড়ে। কিন্তু রাত বারোটায় খুব কাছ থেকেই তা দেখা যায়। আমাদের তাঁবুর ভেতর ওই সময় রীতিমতো রামধনুর খেলা। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু তাঁবুর ভেতরে বেশ গরম। আমার সমস্যা হল, রাতের শয্যা আরামপ্রদ হলেও পাশে রামধনু নিয়ে শোয়া বড় অস্বস্তিকর।

শর্মাজীর বিশেষ ইচ্ছা, এই 'যন্তরমন্তর'টি দিল্লিতে প্রতিরক্ষা গবেষণাগারে পাঠানো হোক। কর্নেলের তাতে আপত্তি। শর্মাজীর বক্তব্য হল, পাকিস্তান

সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সম্ভবত এটা তাদেরই কোনো 'যন্তরমন্তর'। অর্থাৎ শোনা কথায় স্পাইং ডিভাইস। যান্ত্রিক গুপ্তচর।

রেডিও ট্রান্সমিশান যন্ত্রে বারমের থানায় খবর পাঠানোর তিনদিন পরে সেনাবাহিনীর একটা হেলিকপ্টার এসে হ্যাং গ্লাইডারটা ভাঁজ করে গুটিয়ে নিয়ে গেল। ওঁরা সারা তল্লাট তন্নতন্ন খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলেন। ইন্দ্রনীলকে জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থায় দেখতে পান নি।

আজগুবি ডিমটার কথা কর্নেলের অনুরোধে শর্মাজী ওঁদের ফাঁস করলেন না। কিন্তু সারাক্ষণ মুখ বেজার করে আছেন। পঞ্চম দিনে রোজকার কর্মসূচি অনুসারে কর্নেলকে নিয়ে শর্মাজী গেলেন ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত পঙ্গপাল প্রজননক্ষেত্র দেখতে। রাজকুমার তাঁবুর সামনে টেবিল পেতে এলাকার মানচিত্রের একটা চার্ট নিয়ে বসে কী সব মাপজোক করছেন আর মানচিত্রে ফুটকি দিয়ে চলেছেন। আমি ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে নিজের তাঁবুতে ঢুকে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে বসেছি। হঠাৎ কোণায় রাখা প্রকাণ্ড ডিমটা থেকে ক্লিক ক্লিক শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। শব্দটা খুবই চাপা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর হতে থাকল। রাজকুমারকে ডাকব কি না ভাবছি, এই সময় ডিমটা একটু নড়ে উঠল।

তারপর সরুদিকটা নিঃশব্দে ফেটে গিয়ে টুকটুকে লালরঙের একটা মাথা দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ আর দুটো শুঁড়ের মতো কী বেরিয়ে এল। আমি ছিটকে বেরিয়ে চেঁচাতে থাকলুম—রাজকুমার! রাজকুমার! শীগগির এস।

রাজকুমার দৌড়ে এলে তাঁবুর ভেতরে ওই কাণ্ডটা দেখিয়ে দিলুম। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডিমটা পুরোটাই মাঝামাঝি ফেটে বেরিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত প্রাণী। কিংবা পাখি। অথবা পাখি ও স্থলচর প্রাণীর মাঝামাঝি জীব। না—হলফ করে বলতে পারি, এ কদাচ উট পাখির বাচ্চা নয়। নড়বড় করতে করতে দুঠ্যাংয়ে ওটা দাঁড়িয়ে গেল। পা দুটো পাখির মতো, দুপাশে দুটো ডানার মতো জিনিসও আছে। কিন্তু মুখের গড়ন কতকটা মানুষ ও প্যাঁচার মাঝামাঝি। চোখদুটো কপালের ওপর। টানাটানা চোখ। মাথাটা গোল ও চ্যাপ্টা। মাথায় লাল চুল অথবা রোঁয়া। ধড়ের রঙ কালো, পা গাঢ় হলুদ।

চঞ্চু দুটো লাল এবং চঞ্চুর গড়ন দেখেই প্যাঁচার কথা মাথায় এসেছিল। দুপায়ে দাঁড়িয়ে কিম্ভূত জীবটি প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আমাদের দেখছে।

গার্ড ও কর্মীরা দৌড়ে এসে তাজ্জব হয়ে দেখছে। রাজকুমার একজন কর্মীকে তক্ষুনি কর্নেলদের ডাকতে পাঠালেন।

এবার জীবটি একপা একপা করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে রোদ্দুরে এসে দাঁড়াল। অমনি তার শরীর ঝলমল করে উঠল।

সিহোরা থেকে দুজন নদীতে যাচ্ছিল। তারা দৌড়ে এসে জীবটাকে দেখা মাত্র ধপাস করে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল বিকটভাবে—জয়! গরুড় মহারাজ কী জয়!

তারপর তারা গ্রামের দিকে দৌড়ে গেল। একটু পরেই দেখি, গ্রাম থেকে ঢাকঢোল শিঙা কাঁসি বাজাতে বাজাতে বুড়োবুড়ি জওয়ান-জওয়ানি আন্ডা-বাচ্চাশুদ্ধ দৌড়ে আসছে আর গরুড় মহারাজের জয়ধ্বনি হাঁকছে। কাছে এসে তারা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করল। তারপর যে তুমুল কাণ্ড জুড়ে দিল, কান একেবারে ঝালাপালা। গরুড় মহারাজ যেন এই প্রচণ্ড জগঝম্পে তিষ্ঠোতে না পেরে নড়বড়ে ঠ্যাং ফেলে বিরক্ত হয়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

রাজকুমার অনেক চেষ্টায় ভক্তদের থামিয়ে বলল –ব্যাপারটা কী তোমাদের বলো তো শুনি?

গ্রামের মুখিয়া সেলাম দিয়ে বলল—হুজুর রাণাজী! ইনি হলেন বিনতা মাইজীর সন্তান গরুড় মহারাজ। আপনারা তো লিখাপড়া আদমী হুজুর। শাস্ত্রপুরাণ পড়েছেন। গরুড়জীর কথা অবশ্যই জানেন।

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল—বুঝলুম। কিন্তু এই জীবটিকে গরুড় বলছ কেন?

বাঃ! কী বলেন রাণাজী? মুখিয়া বলল। গত বছরও একবার গরুড় মহারাজের কৃপা হয়েছিল। সেবারও উনি কেল্লার মাঠে দর্শন দিয়েছিলেন। দুঘণ্টা ছিলেন। তারপর উড়ে গেলেন। অন্য একজন বলল– সেবার তিনি আরও বড় হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন। এবার উনি যে এত ছোট চেহারায় দর্শন দিয়েছেন, তার কারণ আমাদেরই কেউ পাপ করেছে।

মুখিয়া গর্জন করে বলল—কে কী পাপ করেছ, এখনই মহারাজের সামনে কবুল করো।

এক বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলল—হাঁ মহারাজ! ধনসিংয়ের ছাগলটা এমনি এমনি পাহাড় থেকে পড়ে মরেনি। আমি পাথর ছুঁড়ে তাড়া করেছিলুম। ছাগলটা ঢুঁ মেরে আমার গাগরি ভেঙে দিয়েছিল। গাগরিতে জল ছিল মহারাজ! তখন শুখার মাস!

মুখিয়া এখানেই পঞ্চায়েত ডাকার হুকুম দেয় আর কী! রাজকুমারের ইশারায় গার্ড দুজন বন্দুক উঁচিয়ে তাদের হটিয়ে দিল। লোকগুলো বন্দুককে খুব ভয় পায় মনে হচ্ছিল। কোলাহল করতে করতে তারা গ্রামের দিকে চলে গেল। রাজকুমার বলল—বোঝা যাচ্ছে, এ কোনো বিরল প্রজাতির পাখি। ওরিন্থোলজি (পক্ষিতত্ত্ব) এর খোঁজ রাখে না। যাই হোক, আমরা একে আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছি।

তাঁবুর ভেতর গরুড়জী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর কোণায় রাখা

বিস্কুটের টিনের দিকে নজর যেতেই চঞ্চুতে কামড়ে তুলে নিলেন এবং পায়ের নখ দিয়ে ঢাকনা খুলে বিস্কুটগুলো সাবাড় করতে থাকলেন।

আমাদের উটওয়ালারা ভোরবেলা নদীর ওপারে কাঁটাবনে উট চরাতে গিয়েছিল। কীভাবে খবর পেয়ে উটগুলো চরতে দিয়ে ওরা দৌড়ে এল ক্যাম্পে। তারপর গরুড় মহারাজকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল। তার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ও শর্মাজী হন্তদন্ত ফিরে এলেন।

শর্মাজী যে জিনিসটাকে গুপ্তচর সাব্যস্ত করেছিলেন, তা থেকে এই 'রামগরুড়ের ছানা' বেরুতে দেখে থ বনে গেলেন। তারপর নিরাপদ দূরত্বে পরীক্ষা করার পর হতাশভাবে বললেন—প্রাণিবিজ্ঞানে এমন কোনো জীবের কথা নেই। তাছাড়া ডিমের খোলাটা সিলিকন পাত দিয়ে তৈরি, এও বিস্ময়কর। কারণ সিলিকন প্রকৃতিতে এমন বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া অসম্ভব। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কর্নেল!

কর্নেল একটু করে এগিয়ে খাটের কোণায় চলে গেলেন। গরুড়জীর বিস্কুট খাবার শেষ হয়ে গেছে। এখন জেলির টিন খুলে চঞ্চু ডুবিয়েছেন। চটচটে আঠালো লালরঙের খাদ্যটা ওঁকে একটু বিপাকে ফেলেছে। কর্নেলকে কাছে দেখে তাঁর সাদা একরাশ দাড়িতে হঠাৎ প্রকাণ্ড চঞ্চু ঘষে নিলেন। সাদা দাড়ি লাল হয়ে গেল জেলির রঙে। আমরা হাসতে থাকলুম। কর্নেল একটুও বিব্রত না হয়ে গরুড়জীর কাঁধে হাত রাখলেন। মহারাজ আপত্তি করলেন না। তখন কর্নেল ওঁকে কাছে টেনে ওঁর মুখে জেলি পুরে দিতে থাকলেন।

একটু পরে কর্নেল বললেন—ডঃ শর্মা! ডিমের খোলা সিলিকনের। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমার মনে হচ্ছে এই পাখির শরীরটাও সম্ভবত কোনো জৈব পদার্থে গড়ে ওঠে নি।

শর্মাজী চমকে উঠে বললেন—বলেন কী!

—হ্যাঁ মনে হচ্ছে, এর শরীরও কোনো ধাতু দিয়ে গড়া!

—অসম্ভব! বলে শর্মাজী হাত বাড়িয়ে পরীক্ষা করতে গেলেন। তখনি 'ব্লিক ব্লিক' শব্দ করে গরুড়জী চঞ্চুর ঠোক্কর মারতে এলেন তাঁকে। শর্মাজী আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেলেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—কোনো কারণে আপনাকে পছন্দ করছে না!

শর্মাজী বললেন—ভূতের বাচ্চা কোথাকার! যাই হোক, ওটা নরম না কঠিন?

—কোথাও কোথাও নরম, আবার কোথাও কঠিন।

—ডাকটা শুনছেন ব্যাটাচ্ছেলের? ব্লিক ব্লিক! যেন রেডিও ওয়েভ!

—সেটাও আশ্চর্য! শুনুন। যেন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। ব্লিক ব্লিক···ব্লিক

ক্লিক ক্লিক···ক্লিক !

শর্মাজী গোমড়ামুখে বললেন— আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। নচ্ছার পাখিটা এবেলার প্রোগ্রাম ভেস্তে দিল। পাঁচটা দিন তো প্রাথমিক প্রস্তুতিতেই কেটে গেল। হাতে আর মাত্র দুটো দিন! দেখি, কী করা যায়।

বলে উনি নিজেদের তাঁবুতে চলে গেলেন। আমি সাহস করে গরুড়জীর কাছে গেলুম। কিন্তু যেই ছুঁতে হাত বাড়িয়েছি, গরুড়জী আমাকেও শর্মাজীর মতো চঞ্চু তুলে তেড়ে এলেন। ঝটপট সরে গিয়ে বললুম—কর্নেল! আপনাকে তো কিছু বলছে না। দিব্যি আদর খাচ্ছে চুপচাপ।

কর্নেল হাসলেন শুধু। রাজকুমার বলল—আমাকে পছন্দ করে কি না দেখা যাক। বলে সে যেই এগিয়েছে, গরুড়জী জোরালো ক্লিক ক্লিক আওয়াজ দিয়ে তেড়ে এলেন। রাজকুমার হাসতে হাসতে সরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল তিনফুট উঁচু গরুড় মহারাজকে দুহাতে তুলে নিয়ে বললেন—শ্রীমানকে স্নান করানো দরকার। চলো জয়ন্ত, নদীতে যাই। ফিরে এসে ডিমের খোলাটা প্যাক করে রাখতে হবে।

রাজকুমার শর্মাজীর তাঁবুতে গেছে। আমরা দুজনে চললুম নদীর দিকে। দেখলুম, স্নানে মহারাজের আপত্তি নেই। জল ছিটিয়ে কর্নেল তাকে স্নান করালেন। তারপর একটা পাথরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—রোদ্দুরে শুকিয়ে নাও মাস্টার ক্লিক! ততক্ষণ আমি প্রকৃতিদর্শন করি। বলে বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন।

পঙ্গপাল রহস্যের সূত্রপাত

পঙ্গপালের প্রজননক্ষেত্র অনুসন্ধান কর্মসূচির (ইংরেজিতে সংক্ষেপে L B F 1 P) মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়ান হয়েছে। এদিকে মাস্টার ক্লিক মাত্র দুদিনের বয়সেই পেল্লায় হয়ে উঠেছেন। মাথাটি তাঁবুতে ঠেকছে। দুদিকের চোয়াল থেকে গজানো লাল শুঁড় দুটো ফুটদুয়েক লম্বা হয়ে ঝুলছে। দাড়ি নাকি ?

তার খাদ্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শর্মাজী বিরক্ত! তবে কর্নেল ভেড়ার মাংস সেদ্ধ খাইয়ে দেখেছেন, আপত্তি করে না মাস্টার ক্লিক। প্রজনন-ক্ষেত্রের খোঁজে বেরুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। এ অঞ্চলের পাহাড়ী খাদকে বলে বেহড়। বেহড়ের ভেতর আবিষ্কৃত প্রজননক্ষেত্রের মাটি পরীক্ষা করার পর যেখানে-যেখানে ওই রকম মাটি আছে, সেখানে যাচ্ছেন ওঁরা। কিন্তু পঙ্গপালের টিকিটিও দেখতে পাচ্ছেন না কোথাও।

একদিন রাজকুমার ও আমি সঙ্গী হলুম কর্নেলদের। মাস্টার ক্লিক ক্লিক ক্লিক

আওয়াজ দিতে দিতে মানুষের ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে কর্নেলের পাশে। কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে চলেছেন। এদিন একটা বেহড় থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে বালিয়াড়িতে গিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড উঁচু সব বালির পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিকে আর না এগিয়ে ডাইনে ঘুরতেই লুনি নদী চোখে পড়ল। নদীর পাড়ে পাথুরে মাটিতে শর্মাজীর হাতের অনুসন্ধান যন্ত্রটি রাখতেই ক্লিক করে শব্দ হল। শর্মাজী উত্তেজিতভাবে বললেন—পাওয়া গেছে! রাজকুমার, স্প্রে মেসিনটা দেখি।

মাটিটা ওখানে ফেটে আছে। প্রকাণ্ড সব ফাটলের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে দিনদুপুরেই। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে দূরে কেল্লাটা দেখছিলেন। রাজকুমার স্প্রে মেসিনটা শর্মাজীকে দিল। শর্মাজী যেই বিষাক্ত তরল পদার্থ স্প্রে করতে গেছেন ফাটলের ভেভরে, মাস্টার ক্লিক ঝাঁপিয়ে গেল তাঁর দিকে। স্প্রে ফেলে শর্মাজী মাই গড বলে ছিটকে সরে গেলেন। তাঁকে তাড়া করল মাস্টার ক্লিক। শর্মাজী চেঁচিয়ে উঠলেন—কর্নেল! আপনার বাঁদরটাকে সামলান! এ কী!

'বাঁদর' রাজকুমার আমার দিকেও তেড়ে এল। আমরা দৌড়ে তফাতে গিয়ে দাঁড়ালুম। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে ধমক দিলেন--কি হচ্ছে মাস্টার ক্লিক? এমন করছ কেন?

মাস্টার ক্লিক বলল—ক্লিক ক্লিক ক্লিক……ক্লিক…ক্লিক ক্লিক…ক্লিক!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন তার দিকে! তার শুঁড়দুটো টানটান হয়ে খাড়া। যেন এরিয়েল বা অ্যান্টেনা। ক্রমাগত ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করছে সে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—চলো ডার্লিং! তোমাকে তাঁবুতে রেখে আসি। রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করে কাজ নেই। জয়ন্ত, তোমরা অপেক্ষা করো। আমি এখুনি আসছি।

কর্নেল মাস্টার ক্লিককে নিয়ে বেহড়ের পথে নেমে যাওয়ার পর শর্মাজী গোমড়ামুখে ফাটলগুলোর কাছে এলেন। তারপর বললেন--কোনো কাজ হচ্ছে না! কর্নেলের সায়েবকে গভর্মেন্ট যে কাজে সাহায্য করতে পাঠালেন, ওঁর সে দিকে মন নেই। কাজটা যখন আমাদের দ্বারাই হবে, তখন আর কেন ওঁকে পাঠানো? নাও রাজকুমার। তুমি পাম্প করো, আমি স্প্রে করি।

রাজকুমার স্প্রে মেসিনে বার কতক পাম্প করেছেন এবং শর্মাজী নলটা ফাটলে ঢুকিয়েছেন, অমনি ফাটলের ভেতর থেকে চাপা শিসের শব্দ শোনা গেল। শর্মাজী চমকে উঠলেন। রাজকুমারও থেমে গেল। তারপরে শিসের শব্দটা বাড়তে বাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যা ঘটল, তা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণেরই মতো। ফাটলগুলো দিয়ে শনশন আওয়াজ করে বেরুতে থাকল পঙ্গপালের ঝাঁক। মুহূর্তে আমরা ঢাকা পড়ে গেলুম। কোটি কোটি

—অসংখ্য পঙ্গপাল শনশন শব্দে—এবং সেই তীক্ষ্ন শিসের শব্দ তো আছেই, চারপাশ ওপর-নিচ কালো করে আমাদের কবরে দেবার উপক্রম করল। শর্মাজী চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—পালাও! পালাও! এবার তিনি পাগলের মতো মাথা মুখ ঝাড়তে ঝাড়তে দিশেহারা হয়ে দৌড়লেন। আমরাও দিশেহারা হয়ে দৌড় দিলুম। কিছুদূরে যাওয়ার পর রেহাই পাওয়া গেল। শর্মাজী তখনও দৌড়চ্ছেন। সেই ফাটলগুলোর ওপর যেন কালো মেঘ শনশন করছে—আর সেই শিসের শব্দ।

ক্যাম্পের একটু আগে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেছেন। মাস্টার ব্লিক ওদিকে তাকিয়ে ব্লিক ব্লিক করছে। তাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। শর্মাজী এলে কর্নেল বললেন—ভারি অদ্ভুত তো!

শর্মাজী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—অর্থপেডেইরা গোত্রের পঙ্গপাল এগুলো। এই দেখুন একটা ধরে এনেছি। প্রজাতি হল সিস্টেসার্কা গ্রেগরিয়া। ডেজার্ট লোকাস্ট বলা হয়। কিন্তু এদের এমন অদ্ভুত আচরণের কথা জানা নেই।

কর্নেল ফড়িংটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে বললেন—মাই গুডনেস! ডঃ শর্মা! দেখুন ভাল করে, এটার দেহে যেন কোনো জৈবিক পদার্থ নেই। ধাতব উপাদানে তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

শর্মাজী পরীক্ষা করে বললেন—তাই তো দেখছি, কর্নেল। এই ঠ্যাংটা দেখুন। ভাঙা যাচ্ছে না। ইস্পাতের তারের মতো। দেখুন কেমন বেঁকে রইল। অথচ ভাঙল না। আরে! এটা দেখছি ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে।

কর্নেল বললেন—এখনই বারমের রেডিও মেসেজ পাঠান ডঃ শর্মা। কোনো বিশেষজ্ঞকে আসতে বলুন। এমন কাউকে পাঠাতে বলুন, যিনি একাধারে পদার্থবিদ, ধাতুবিজ্ঞানী এবং বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সেও যাঁর জ্ঞানগম্যি আছে।

রাজকুমার বলল—অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কেন কর্নেল?

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন—ডার্লিং! তুমি তো একজন বিজ্ঞানী। তুমি তো জানোই যে আমাদের এ ছোট্ট মরজগতের সবকিছুই মহাকাশ এবং সমগ্র গ্যালাক্সির সঙ্গে সম্পর্কিত। আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন করে কোনো জিনিস সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করব। পৃথিবীতে যে প্রাণ নিয়ে আমাদের অস্তিত্ব, তারও মৌলিক উপাদান মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক ধূলিকণার সঙ্গে একদা ভেসে এসেছিল—এমন কথাও বলছেন আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা। এ যুগে আমরা আর শুধু পৃথিবীর সন্তান নই। মহাজাগতিক এক বিশাল সংসারের অন্তর্ভুক্ত।…

মাস্টর ব্লিকের অন্তর্ধান

বিকেলের মধ্যেই হেলিকপ্টারে চেপে এলেন বিশেষজ্ঞমশাই। দেখলুম, কর্নেলের পূর্বপরিচিত তিনি। নাম পৃথিবীজিৎ সিং। পাঞ্জাবের শিখসম্প্রদায়ের মানুষ। বারমেরে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজে এসেছিলেন। খবর পেয়ে নিজেই উৎসাহী হয়ে চলে এসেছেন। হেলিকপ্টারটা তাঁকে রেখে চলে গেল। সঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি এনেছেন ডঃ সিং। ঘণ্টাখানেক ফড়িংটাকে পরীক্ষা করে বললেন—আপনারা এটাকে রোবট ভেবেছিলেন। তা নয়। ঝাঁকে ঝাঁকে এমন রোবট তৈরি করতে হলে ধনী দেশকেও ফতুর হতে হবে তিনদিনে। আসলে এটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তৈরি।

শর্মাজী বললেন—কী কাণ্ড! আমার মাথায় কথাটা একবার এসেছিল বটে!

—হ্যাঁ। ক্লোনিং আণবিক জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক্স বা প্রজনন বিদ্যার একটি আধুনিক তত্ত্বমূলক প্রক্রিয়া। ডঃ সিং একটু হাসলেন। ডঃ শর্মা তো এসব জানেন। কর্নেলের কাছেও বিষয়টা আশাকরি অপরিচিত নয়। মনে আছে? দিল্লীতে গত বছর আপনি আমার সঙ্গে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—আচ্ছা ডঃ সিং, ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তো একটিমাত্র জৈব কোষকে কৃত্রিম উপায়ে বিকাশ ঘটিয়ে প্রয়োজন সংখ্যক ক্রোমোজোমের জোড়কে সাজিয়ে একটা ফর্মে আনা যায়।

—হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা তত্ত্বের আকারেই ছিল। অথচ এক্ষেত্রে দেখছি কোনো কুশলী মস্তিষ্ক সেই তত্ত্বকে বাস্তবে সফল করেছেন। কে এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী?

শর্মাজী বললেন—নিশ্চয় কোনো শত্রুদেশের বিজ্ঞানী তিনি। ভারতের শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপাল নামিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্ত এটা। তিনি বিজ্ঞানী হলেও তাঁকে বলব ঘৃণ্য অমানুষ। তাঁর ফাঁসি হওয়া উচিত।

ডঃ সিং বললেন—তা তো উচিতই। কিন্তু তাঁর প্রতিভা অস্বীকার করা যায় না। সিস্টেরাসার্কা গ্রেগরিয়া প্রজাতির ফড়িংয়ের একটিমাত্র দেহ কোষ থেকে তিনি ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় একটি ফড়িং সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই ফড়িংটি অতিপ্রজননশীল। তার বংশধররাও তাই অতিপ্রজননশীল হয়েছে। আমার ভাবতে আতঙ্ক হয়, এভাবে হিটলারের একটিমাত্র দেহকোষ থেকে কত অসংখ্য হিটলার তৈরি করতে পারতেন—যদি এই বিজ্ঞানী সে সময় জার্মানিতে আবির্ভূত হতেন।

কর্নেল বললেন—এবার তাহলে আমাদের মাস্টার ব্লিককে নিয়ে আসি। তাকেও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে কি না দেখা যাক।

শীতের বিকেল দ্রুত পড়ে এসেছে। সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে চারদিকে।

আমরা শর্মাজীর তাঁবুর সামনে বসে কথা শুনছিলুম। মাস্টার ব্লিক কর্নেলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। একটু পরে তাকে আমাদের তাঁবুর দিকে যেতে দেখেছি।

কর্নেল তাঁবুর সামনে গিয়ে ডাকলেন—মাস্টার ব্লিক! এস ডার্লিং।

কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ভেতরে গেলেন। তারপর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরে ডাকতে থাকলেন। কোনো সাড়া নেই ছোকরার। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন - এই তো ছিল! গেল কোথায় সে? তারপর বাইনোকুলারে চোখ রেখে চারদিকে তন্নতন্ন খুঁজলেন।

এইসময় সিহোরার একদল মেয়ে নদীর থেকে আসছিল। তারা খুব উত্তেজিতভাবে আসছিল। কর্নেল জিগ্যেস করেলেন—তোমরা কি গরুড় মহারাজকে দেখেছ?

তারা একসঙ্গে হইচই করে উঠল। একজন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল— গরুড় মহারাজকে এইমাত্র আমরা নদীর ওপর দিয়ে উড়ে কেল্লার দিকে যেতে দেখলুম হুজুর! তবে তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার দেখে আমরা পালিয়ে আসছি। জল ভরতে পারিনি। খালি গাগরি নিয়ে পালিয়ে আসছি হুজুর!

—কী ব্যাপার দেখেছ তোমরা!

—কেল্লার মধ্যে দানো থাকে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম আমরা। হলদে রঙের একটা 'এত্তাবড়া' মাকড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল, হুজুর!

কর্নেল বললেন, ব্যাপারটা দেখতে হয়। জয়ন্ত, যাবে নাকি?

আমি এগিয়ে গেলুম। রাজকুমার ও পৃথ্বীজিৎ সিংও ব্যস্তভাবে সঙ্গ ধরলেন। কী ভেবে রাজকুমার একজন বন্দুকধারী গার্ডকেও ডেকে নিল। আমরা দলবেঁধে লুনি নদীর দিকে ছুটে চললুম।

নদীর কাছে আমাদের উটওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হল। তারা উটের পাল ডাকিয়ে ব্যস্তভাবে আসছিল। ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলল—ওদিকে যাবেন না স্যার! কেল্লাবাড়িতে হলদেরঙের কী একটা দেখে উটগুলো ভয় পেয়েছে। আমরা তাই এদের ডাকিয়ে নিয়ে আসছি।

কেল্লায় গিয়ে টর্চের আলোয় তন্নতন্ন খুঁজে কোনো জনপ্রাণীটি দেখা গেল না। 'এত্তাবড়া' মাকড়সা কিংবা কোনো হলদেরঙের জিনিসও না। তবে কর্নেল টর্চের আলো কেল্লার চত্বরে ফেলে একখানে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর সেদিনকার মতো পরীক্ষা করে বললেন—কয়েকটা লম্বা আঁচড়ের দাগ। কিসের দাগ?

কেল্লা থেকে নেমে সেই স্তম্ভটা পর্যন্ত আমরা গেলুম। সেইসময় আমি যেন কোথাও ব্লিক শুনলুম একবার। হয়তো কানের ভুল। তাই কথাটা বললুম না কর্নেলকে।

অনেকক্ষণ আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে আমরা ক্যাম্পে ফিরে চললুম।…

ক্যাম্পে এ রাতে জরুরী কনফারেন্স। গরুড় মহারাজ ওরফে মাস্টার ব্লিকের সেই প্রজনন কথা অর্থাৎ ডিমের ভাঙা খোলস পরীক্ষা করে পৃথ্বীজিৎ সিং সিলিকনই সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, ওই কিম্ভূত বৃহৎ পক্ষীটিও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। সিলিকন ধাতু কম্পিউটার বা রোবোটের প্রধান উপাদান। জাপানে এ ধাতুর সাহায্যে অসম্ভব-অসম্ভব কাজ চালানোর উপযোগী যন্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগকে সিলিকন ধাতুর যুগই বলা হয়।

ডঃ সিংয়ের বক্তব্য শুনে কর্নেল বললেন—তাহলে আরও ডিম খুঁজে পাওয়া উচিত। পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো! কাল আমরা ওই এলাকা খুঁজে দেখব।

শর্মাজী আঁতকে উঠে বললেন—ইতিমধ্যে যদি ডিমগুলো ফুটে গরুড়-পক্ষীর ছানা বেরিয়ে থাকে তো কেলেঙ্কারি!

রাজকুমার মুচকি হেসে বলল, খুড়োমশাইকে তাহলে বারমের থেকে পালিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে।

শর্মাজী চটে গেলেন-- বেশি বকো না। তোমারও একই অবস্থা হবে। বলে আমার দিকে কটাক্ষ করলেন।--এই সাংবাদিক ভদ্রলোককেও হতচ্ছাড়া পাখিটা পছন্দ করে না দেখছি।

কর্নেল এসব কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন- এবার বলুন ডঃ সিং, আপাতত ওই পঙ্গপালের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শীগগির একটা কিছু না করলে তো মার্চ-এপ্রিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোথাও চাষীরা ফসল ঘরে তুলতে পারবে না। সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে এই শক্তিশালী পঙ্গপাল।

পৃথ্বীজিৎ একটু ভেবে বললেন--প্রতিরক্ষা দফতরে কেমিকেল রিসার্চ সেন্টার থেকে সদ্য আবিষ্কৃত মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ RRO-27 পরীক্ষার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। প্রয়োগ করে দেখা যাক না কী হয়। তবে—

উনি গম্ভীরভাবে চুপ করলে কর্নেল বললেন--তবে!

- ফাটলগুলোর সঙ্গে যদি নদীর যোগাযোগ থাকে, জল বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ এখন তত জল নেই নদীতে। কিন্তু আগামী বর্ষায় জলস্রোত এসে ফাটলে ঢুকবে।

শর্মাজী উত্তেজিতভাবে বললেন—পরের কথা পরে। আগে পঙ্গপাল নিধন।...

চিন্তাভাবনার মধ্যে কনফারেন্স শেষ হল রাত বারোটা নাগাদ। তারপর আমরা শুয়ে পড়লুম ক্যাম্পখাটে। সবে একটু তন্দ্রামতো এসেছে, বাইরে শনশন শব্দে ঘোর কেটে গেল। শব্দটা ঝড়ের বলে মনে হচ্ছিল। ডাকলুম— কর্নেল। কর্নেল!

কার্নেলের নাক ডাকছিল। বন্ধ হয়ে গেল। বললেন-- কী হয়েছে?

—ঝড় আসছে।

হুঁ, শীতের সময় আরবসাগর থেকে কচ্ছপ্রদেশ পেরিয়ে একটু আধটু ঝড়বৃষ্টি এ তল্লাটে এসে থাকে শুনেছি। তোমার চিন্তার কারণ নেই। ক্যাম্পের খুঁটি যথেষ্ট মজবুত।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল এবং চাপা গুরুগুরু গর্জন শোনা গেল। গর্জনটা একটানা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে যে বহুদূরপ্রসারী চাপা গরগর আওয়াজ শোনা যায়, ঠিক তাই। তারপরই ঝড়টা এসে ক্যাম্পের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

তারপর কী একটা ঘটল যেন! তীব্র নীল বিদ্যুতের ঝলকানি, কান ফাটানো বজ্রগর্জন—পরক্ষণে দেখি খোলা আকাশের তলায় বসে আছি। ক্যাম্পখাটটা আমাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।-- কর্নেল! কর্নেল! বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় উবুড় হয়ে পড়ে গেলুম। টের পেলুম, ক্যাম্পখাট এবং তাঁবুর ভেতরকার সব জিনিসপত্র উড়ে বেরিয়ে গেল। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম। ওপরে প্রলয়কাণ্ড চলতে থাকল। সেই ব্যাপক গরগর চাপা গর্জন এখন আমার চারদিকে।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্যে তীক্ষ্ম একটা শিসের শব্দ-- যেমন শিসের শব্দ পঙ্গপালের ব্রিডিং গ্রাউন্ডে ফাটলের ভেতর শুনেছি, তার লক্ষগুণ বেশি জোরালো শব্দটা কানের ভেতর দিয়ে সূঁচের মতো মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছিল। অসহ্য লাগাতে দুকানের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পড়ে রইলুম।

পরে শুনলুম, এই সর্বনাশা ঝড়ের স্থিতিকাল ছিল মাত্র তিনমিনিট।

ঝড় থামলে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে ডাকলুম—কর্নেল! আপনি কোথায়?

কর্নেলের সাড়া পেলুম আমার পাশ থেকে।-- আছি, জয়ন্ত! এবার উঠে পড়ো! ঝড় থেমে গেছে।

এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। চারদিকে কেমন একটা নীলচে রঙের আলো। অথচ আকাশ পরিষ্কার। কৃষ্ণপক্ষের এক টুকরো চাঁদ লুনি নদীর ওপর দক্ষিণপূব আকাশে ঝুলে আছে। আবহাওয়া শীতের বলে মনে হচ্ছে না--যেন গ্রীষ্মরাতের। ফলে গরম সোয়েটারের ভেতর দরদর করে ঘামছি।

মিনিট খানেকের মধ্যে নীলচে আভাটা মিলিয়ে গেল। তাপটাও কমতে কমতে আবার মরুভূমির শীত এসে হাজির হল। কর্নেল টর্চ জেলে শর্মাজীদের খুঁজছিলেন। দেখলুম, একে একে ওঁরা হামাগুড়ি দিতে দিতে দুপায়ে সোজা হচ্ছেন এতক্ষণে। ওদিকে উটওয়ালাদেরও কথাবার্তা শোনা গেল। লণ্ঠন জ্বলতে দেখলুম।

জেনারেটরটা নষ্ট হয়ে গেছে কোনো অজ্ঞাত কারণে। কিছুতেই আর সেটা চালু করা গেল না। পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালা হল। তারপর পেছনের পাথরের

স্তূপে আটকে থাকা তাঁবু, ক্যাম্পখাট এবং জিনিসপত্র সবাই মিলে বয়ে আনলুম।

সিহোরা থেকে কান্নাকাটি ও কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আলো নিয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল গ্রামবাসীরা। আমাদের ক্যাম্পগুলো আবার সাজিয়ে নিতে নিতে ভোর চারটে বেজে গেল। উত্তর থেকে এখন প্রচণ্ড হিম মরুবাতাস এসে হাড় কাঁপিয়ে তুলছে।

মাস্টার ব্লিকের খোঁজ মিলল

ক্যাম্পের সব যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। রেডিও ট্রান্সমিশন অচল। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সকালে ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ্য করতে গিয়ে সবারই চোখে পড়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বস্তুর কোনো ক্ষতি হয় নি। শুধু মানুষের তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট যা কিছু, তাকেই বিশৃংখল করে গেছে ওই অদ্ভূত ঝড়। সিহোরা গ্রামের ঘরগুলো পাথরের। বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু গৃহপালিত পশুরা অক্ষত নেই। অনেক মারা পড়েছে। অনেক পশু জখম হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, যে বুড়ি ধন সিং নামে একটা লোকের ছাগলের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, শুধু সে বেচারী মারা পড়েছে ঘর ধসে। ঢাকঢোল শিঙা কাঁসি বাজিয়ে গ্রামবাসীরা গরুড় মহারাজের পুজো দিচ্ছিল শ্মশান থেকে ফিরে।

শর্মাজী খুব ভয় পেয়ে গেছেন। ভোরবেলা স্নান করে চলে গিয়েছিলেন সিহোরা গ্রামের মন্দিরে প্রণাম করতে। তারপর গ্রামবাসীর দলে ভিড়ে গেছেন। পৃথীজিৎ সিং অচল রেডিও ট্রান্সমিশন নিয়ে বসে গেছেন। তাঁকে সাহায্য করছে রাজকুমার।

কর্নেল আমাকে ডেকে নিয়ে নদী পেরিয়ে কেল্লার দিকে চললেন। পথে যেতে যেতে বললেন—তিনটে ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। এক ঃ ঝড়টা ছিল শুকনো— বৃষ্টিহীন। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। দুই ঃ ঝড়ের সময় প্রথমে চাপা গরগর শব্দ, তারপর তীক্ষ্ন হুইসেলের শব্দ। তিন ঃ ঝড়ের পর কিছুক্ষণ নীলচে আভা। আমি ওই সময় চাঁদের দিকেও লক্ষ্য করছিলুম। চাঁদটা পর্যন্ত নীলচে দেখাচ্ছিল।

ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, কাল সন্ধ্যায় কী একটা হলদে জিনিস দেখে উটগুলো ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া গ্রামের মেয়েরা নাকি কেল্লার ওপর দানোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল—দানোটা দাঁড়িয়ে ছিল হলদে রঙের মাকড়সার পিঠে।

কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন—মাকড়সা! প্রথমদিন বিকেলে ওখানে মাটির ওপর সূক্ষ্ম লম্বাটে আঁচড় দেখেছি আতসকাচের সাহায্যে। রাজকুমার বলছিল এ এলাকায় সরু মাকড়সাগুলো প্রকাণ্ড হয়। আঁচড়গুলো যদি মাকড়সার পায়ের হয়, তাহলে বলব, মাকড়সাটা একটা মোটরগাড়ির মতো বড়। কিন্তু গোলাকার।

আমার মাথার ভেতর ঝিলিক দিল একটা কথা। বললুম—কর্নেল! জিনিসটা স্পেসশিপ নয় তো?

কর্নেল হাসলেন।—ডার্লিং! স্পেনশিপ বলতে কি তুমি অন্য কোনো গ্যালাক্সির প্রাণীদের দিকে ইঙ্গিত করছ?

—কেন? অসম্ভব কিসে?

—অন্য গ্যালক্সির চেয়ে আমাদের গ্যালাক্সিতেই এমন অসংখ্য রহস্য আছে জয়ন্ত, যা আমাদের চক্ষু ছানাবড়া করার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া এখনও এই গ্যালাক্সি ছাড়া অন্যত্র প্রাণ আছে কিনা আমরা জানি না। বৃথা কল্পনায় লাভ নেই। তার চেয়ে—

হঠাৎ থেমে উনি বাইনোকুলারে কী দেখতে থাকলেন কেল্লার দিকে। তারপর হনহন করে হাঁটিতে শুরু করলেন। জিগ্যেস করেও কোনো জবাব পেলুম না। কেল্লার কাছাকাছি পেঁাছে কানে এল ব্রিক ব্রিক শব্দ। চমকে উঠলুম। কর্নেল এখন দৌড়ুতে শুরু করেছেন। বুড়োর নাগাল পেতে আমার মতো জোয়ানের হাঁফ ধরে যাচ্ছিল।

কেল্লায় উঠে চত্বরে ঢুকেই দেখি, মাস্টার ব্রিক কাত হয়ে পড়ে আছে। কর্নেলকে দেখে সে ডানাদুটো নেড়ে কাতরভাবে ব্রিক ব্রিক করতে থাকল। কর্নেল তাকে দুহাতে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। মাস্টার ব্রিক অনেক কষ্টে দাঁড়াল। তারপর কর্নেলের বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে প্রকাণ্ড চঞ্চু ফাঁক করল। কর্নেল পকেটে হাত ভরে একগাদা বিস্কুট বের করে ওকে খাওয়াতে থাকলেন। বললেন—ঠিক এমন কিছু অনুমান করেই বিস্কুটগুলো এনেছিলুম। জয়ন্ত আমার কোটের পকেটে জেলির টিন এনেছি। বের করে দাও।

তা করতে গেলে হতচ্ছাড়া ব্রিক চোখ ট্যারা করে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু ওর চঞ্চুর ভেতর বিস্কুট। তাই ঠোক্কর মারবার চেষ্টা করল না। রাগ করে বললুম—আমাকে কেন দেখতে পারে না বলুন তো? অথচ ও যখন ডিমের ভেতর ছিল, তখন আমিই ওকে এতটা পথ বয়ে নিয়ে গেছি। নেমকহারাম কোথাকার!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় জন্ম হলেও মাস্টার ব্রিকের মধ্যে স্বাভাবিক জৈব সহজাত বোধ রয়েছে। মানবেতর জীবরা সেই বোধের সাহায্যে ঠিকই টের পায়, কে তাদের পছন্দ বা অপছন্দ করছে। তুমি নিশ্চয় ওকে অপছন্দ করো, ডার্লিং!

—ঠিক অপছন্দ নয়। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওর গায়ের গন্ধে।

—মাস্টার ব্রিক কাল রাতের ঝড়ে আহত হয়েছে। ওকে একটু আদর করো। দেখবে আর তোমাকে ঠোক্কর মারতে চাইবে না! নাও, জেলিটা খাইয়ে দাও ওকে।

ভয়ে ভয়ে কৌটো থেকে খানিকটা জেলি নিয়ে ওর চঞ্চুর ভেতর গুঁজে দিলুম। ডানায় ও লাল টুকটুকে চ্যাপ্টা মাথায় হাত বুলিয়েও দিলুম; কর্নেল

ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে চত্বরে কী সব তদন্ত শুরু করলেন। কয়েক গ্রাস খেয়ে মাস্টার ব্লিক হঠাৎ এঁটো চঞ্চুটা আমার সোয়েটারে ঘষতে থাকল। জেলিতে মাখামাখি হয়ে গেল। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললুম—তবে রে রাম গরুড়ের ছানা !

মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক করে যেন হাসল। নড়বড়ে ঠ্যাংয়ে এবার টাল সামলে খাড়া হতে পারল সে। কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, তোমার অনুমান আংশিক সত্যি হতেও পারে। যে হলদেরঙের মাকড়সার কথা আমরা শুনেছি এবং তুমি যাকে স্পেসশিপ বলেছ, সেটা সত্যিই স্পেসশিপ। এখানেই ওটা নেমেছিল। তবে অন্য গ্যালাক্সির নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি যে সেই উড়ুক্কু গাড়িটি গত রাতে ইচ্ছে করেই আমাদের ক্যাম্পের ওপর ঝড় সৃষ্টি করে গেছে। সব রহস্য ওতেই কেন্দ্রীভূত।

—বলেন কী ! কী করে বুঝলেন ?

—তথ্য থেকে ডিডাকশান করে। কর্নেল চুরুট ধরালেন। —কাল সন্ধ্যার মুখে উড়ুক্কু গাড়িটাকে এখানে গ্রামের মেয়েরা দেখেছিল। কিন্তু তার আগে কোনো ঝড় হয় নি।

মাস্টার ব্লিক নড়বড় করে হেঁটে প্রাকারের ধারে গেল। তারপর বারবার ব্লিক ব্লিক করে করে ডাকতে থাকল ! কর্নেল এগিয়ে বললেন—কী হয়েছে মাস্টার ব্লিক ?

বলে তিনি চোখে বাইনোকুলার রেখে পূর্ব-উত্তর দিকের মরুভূমির বালিয়াড়ি দেখতে থাকেন। একটু পরে অস্ফুটস্বরে বললেন—কাকে যেন দেখলুম বালিয়াড়ির আড়ালে।

বালিয়াড়ির মাথায় এখনও ধূসর কুয়াশা আলোয়ানের মতো জড়ানো রয়েছে। আমি কিছু দেখতে পেলাম না। ওদিকটা দিগন্ত অব্দি ধূসর হয়ে আছে—মাইলের পর মাইল বালির সমুদ্র। থর মরুভূমির দক্ষিণ অংশটা বেঁকে পূবে ঘুরে আবার দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল চওড়া একটা ফালির মতো এগিয়ে কচ্ছ প্রদেশের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মানচিত্রেই দেখেছি এটা। ক্রমশ না কি আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে মরুভূমি। প্রতিরোধের জন্য সরকার অজস্র প্রকল্প করেছেন। কচ্ছের অন্তর্গত রানের জলাভূমি এলাকা থেকে এই সিহোরা পর্যন্ত কোনো জনপদ নেই। কাজেই ওদিকে কোনো মানুষ বাস করে না। গাছপালা দূরের কথা একটা ঘাস পর্যন্ত গজায় না।

শুধু লুনি নদীর দুধারে কিছু সবুজের চিহ্ন। ক্ষয়াটে রুক্ষ গাছ আর কাঁটাগুল্ম গজায়। নদীটা গিয়ে রান জলাভূমিতে পড়েছে।

কর্নেল অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—নাঃ ! চোখের ভুল। চলো, ক্যাম্পে ফেরা যাক। মাস্টার ব্লিকের শুশ্রূষা করা দরকার। কাল রাতের ঝড়ে বেচারা ঘায়েল হয়ে পড়েছে।···

বন্দী অথবা অতিথি

মাস্টার ব্লিকের পুনরাবির্ভাবে শর্মাজী এত খচে গেলেন যে কিচেন ক্যাম্পে গিয়ে বসে রইলেন সারা বেলা। পৃথিবীজিৎ তার কাছ ঘেঁষতে সাহস পেলেন না। একটু দূরে থেকে দেখে রায় দিলেন—এও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। তবে এটুকু বলা যায়, পেঁচা এবং ঈগলের দেহকোষ মিশ্রণে এই বিদঘুটে পাখিটির উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষ সংখ্যক ক্রোমোজোম জোড় সাজিয়ে একটা ফর্মে আনা হয়েছিল মিশ্রিত কোষটিকে। তারপর সিলিকনের পাত দিয়ে ডিম তৈরি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিহোরাবাসীদের পুজোর ঘটায় আমাদের কান ঝালপালা হয়ে যাচ্ছিল। মাস্টার ব্লিককে বাইরে একটা খুঁটি পুঁতে ঠ্যাংয়ে নাইলনের দড়ি বেঁধে রাখতে হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবিতে আর তাকে ক্যাম্পের ভেতর ঢোকানো যায় নি। নির্বিকার ভঙ্গীতে 'গরুড় মহারাজ' পুজোর প্রসাদ খেয়ে চলেছেন। তারপর দুটো ভেড়াও বলি দেওয়া হল। আতঙ্কে দেখলুম, মাস্টার ব্লিক চঞ্চু এবং পায়ের সাহায্যে কাঁচা মাংস শকুনের মতো ভক্ষণ করছে। কর্নেল ওকে সেদ্ধ মাংস খাওয়াতেন। রাজকুমার অবাক হয়ে বলল—এরকম পেটুক কখনও দেখি নি। দুটো ভেড়া হজম করতে পারবে তো?

বিকেল নাগাদ পুজোর ধুমধাড়াক্কা শেষ হল। স্বস্তি পেয়ে ক্যাম্পে ঢুকে সবে একটু গড়াতে গেছি, বাইরে কর্নেলের চিৎকার শুনলুম—মাস্টার ব্লিক! মাস্টার ব্লিক!

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, নাইলনের মজবুত রশি ছিঁড়ে মাস্টার ব্লিক দৌড়ে চলেছে। কর্নেলও দৌড়ুচ্ছেন পেছনে পেছনে। তারপর ডানা মেলল পাখিটা। নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কেল্লার দিকে। দুটো ভেড়া খেয়ে ওর গায়ে জোর ফিরে এসেছে বেড়েও গেছে সন্দেহ নেই।

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। তারপর ঘুরে ঈশারা করলেন আমাকে যেতে। কাছে গেলে বললেন—কেল্লায় থাকতে মতলব ওর। এস তো দেখি, আবার ধরে আনতে পারি নাকি।

কেল্লার কাছাকাছি গিয়ে সকালের মতো ওর ব্লিক শুনতে পেলুম। চত্বরে পেঁৗছে দেখলুম, ডানা খুঁটছে—একটা ঠ্যাং অন্য ঠ্যাংয়ের হাঁটুতে আঁকড়ানো। অবিকল বকের ভঙ্গীতে।

কর্নেল ডাকলেন—মাস্টার ব্লিক!

পাখিটা হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে মুর্গির মতো মাটিতে বসে পড়ল। তারপর চাপা হুইসলের শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চমকে উঠলেন—সর্বনাশ! আবার সেই ঝড় আসছে নাকি?

শনশন হল। বিদ্যুৎগতিতে পূর্বদিক থেকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে

হলুদরঙের বিশাল মাকড়সার মতো একটা জিনিস এসে চত্বরে আমাদের সামনেই নামল। মুহূর্তে বুঝলুম, এটা স্পেসশিপ—কর্নেলের বর্ণিত উড়ুক্কু গাড়ি। শিস ও শনশন শব্দ থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ওপরের ঢাকনাটা নিঃশব্দে খুলে ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল আপাদমস্তক আঁটা কালো পোশাকপরা একটা মূর্তি। তার চোখে কালো চশমা।

সে একলাফে নেমে আমাদের সামনে এসে ইশারা করল উড়ুক্কু গাড়িটাতে চাপতে। তার হাতে একটা পিস্তলের মতো জিনিস। নলের মুখ দিয়ে রঙবেরঙের ঝিলিক বেরুচ্ছে।

কর্নেল আস্তে বললেন—চলো জয়ন্ত! বাধা দিলে লেসার পিস্তল ছুঁড়তে পারে।

রহস্যময় আগন্তুক হলুদ গোলাকার গাড়ির ওপর একটা বোতাম টিপতেই একটা সিঁড়ি নেমে এল নিঃশব্দে। আমরা উঠে গিয়ে ওপরকার সুড়ঙ্গের মতো দরজা দিয়ে ভেতর ঢুকে গেলুম। ভেতরে চারজন বসার মতো বৃত্তাকারে সাজানো আসন রয়েছে। আমরা বসলে লোকটা মাস্টার ব্রিককে তুলে নিয়ে এল। তাকে মেঝেয় চেপে বসিয়ে দিল। তারপর চশমা খুলে আমাদের দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল—আদেশ পালনের জন্য ধন্যবাদ। এবার কোমরে সিটবেল্ট বেঁধে নিন। কর্নেল কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু তখন লোকটা আবার চশমা পরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারপর হিশ্ করে একটা শব্দ হল। তারপর শিস এবং শনশন আওয়াজ। পাশের ছোট্ট বৃত্তাকার জানালা দিয়ে দেখলুম আমরা আকাশে চলে এসেছি। অজ্ঞাত ভয়ে বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে।

মাত্র মিনিট তিনেক হয়েছে কিনা সন্দেহ। শেষ বেলার আলোর নিচে সমুদ্রের মতো বিস্তীর্ণ জল চোখে পড়ল। তারপর আবার শিসের শব্দ, শনশন আওয়াজ—তারপর দেখি আমরা জলে নেমেছি। তরতর করে জল ছুঁয়ে ছুটে চলেছে একটা জলমাকড়সার মতো এই অদ্ভুত গাড়িটা। একটুও জল ছিটকে পড়ছে না। জলে দাগ কাটছে না। মনে হল, এটার যেন কোনো ওজনই নেই। তাই মাটিতে কোনো চিহ্ন খালিচোখে দেখা যায় নি। কর্নেলকে আতসকাচ ব্যবহার করতে হয়েছিল। ওজন নেই বলে মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো আঁকসি বের করে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে।

সামনে সবুজ রেখা ফুটে উঠল। দ্বীপ সম্ভবত। বেলাভূমির বালির ওপর পিছলে উঠে পড়ল গাড়িটা। তারপর এগিয়ে চলল তেমনি তরতরিয়ে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম, গাড়িটার ঠ্যাং আছে মাকড়সার মতো। পথ বলতে কিছু নেই। চড়াইয়ে উঠে গেছে সমতল মাটি। দুধারে জঙ্গলা উঁচু সব গাছ। একখানে থেমে গেল গাড়ি। লোকটা বলল—আসুন গরিবের পর্ণকুটিরে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি বনের ভেতর একটা জীর্ণ পাথরের বাড়ি—দেখতে

কেল্লার মতো। মাথার ওপর গাছপালা বলে আবছা আঁধার ছমছম করছে। লোকটার আঙুলের ডগায় আলো ফিট করা আছে। সেই আলোয় ওর পেছনে পেছনে হেঁটে চললুম। ওর কোলে মাস্টার ব্লিক চুপচাপ বসে আছে। ঠ্যাং ঝুলছে।

অপরাধীর শাস্তি মৃত্যু

জীর্ণ বাড়িটা পাথরের। ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় নেমে লোকটা জুতোর ডগা দিয়ে কিসের ওপর চাপ দিল। টুং করে শব্দ হল কোথাও। তারপর দেখলুম, ঘরটা আলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে একটা রেলিংঘেরা চৌকোণা ইঁদারার মতো গর্ত রয়েছে। একটু পরে সেই গর্ত থেকে উঠে এল লিফট। লিফটের দরজা খুলে লোকটা বলল—আসুন।

লিফটে চেপে আমরা এবার যেখানে নামলুম, সেটা একটা সাজানো গোছানো সুন্দর হলঘর। উজ্জ্বল আলোয় ভরা। একদিকে বসার চেয়ার টেবিল, শোবার খাট, বইয়ের র‍্যাক অনেকগুলো। অন্যদিকটায় বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি, টিভি পর্দাসমন্বিত কম্পিউটার কয়েকটা, তার ওপাশে ল্যাবরেটরি। একটা লম্বা টেবিলের ওপর কাচের কফিন। কফিনের ভেতর একটা আস্ত মড়া। ভয়ে ভয়ে সেইদিকে তাকিয়ে আছি, লোকটা একটু হেসে বলল—ওটা মৃত মানুষ নয়। সম্পূর্ণ জীবিত। তবে অজ্ঞান অবস্থায় রাখা হয়েছে। আপনারা বসুন দয়া করে।

সে মাস্টার ব্লিককে দাঁড় করিয়ে আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল…যাও হে। কুটুম্বদের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো। আর শুনুন, আপনাদের সেবার কোনো ত্রুটি হবে না। কিন্তু সাবধান, আসন ছেড়ে নড়বেন না। তাহলে আপনাদের বিপদ হবে। আমি আমার স্পাইডারশিপের ব্যবস্থা করে এখনই ফিরে আসছি।

স্পাইডারশিপ! মাকড়শাযান। ঠিক তাই বটে। গাড়িটার চাকা নেই। ঠ্যাং বাড়িয়ে ঠিক মাকড়সার মতো দৌড়ে যায় এবং জলের ওপর জলমাকড়সার মতোই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যেতে পারে। আবার আকাশেও রকেটের মতো অবিশ্বাস্য গতিতে উড়ে চলে। খেলোয়াড়দের ডিসকাস থ্রোয়িংয়ের মতো ব্যাপারটা।

কর্নেল গম্ভীর মুখে চারদিক লক্ষ্য করছিলেন। মাস্টার ব্লিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও আর ব্লিক করছে না। কোথায় যেন খুবই চাপা শোঁ শোঁ শব্দ, মাঝে মাঝে ব্লিক্ ব্লিক্, কখনও খুট্‌খাট্ যান্ত্রিক শব্দ। বুঝতে পারছিলুম এক আধুনিক বিজ্ঞানীর গোপন আখড়ায় এসে পড়েছি।

ব্লিক্…ঠুং…খুটখুট শব্দ। তারপর দেখি ওপাশের দরজা খুলে গেল এবং একটা আস্ত ক্ষুদে রোবট গদাইলস্করি চালে হেঁটে আমাদের সামনে এসে

দাঁড়াল। তার বুকে ছোট্ট টিভি পর্দায় নীল-লাল রেখা কাঁপতে কাঁপতে ফুটে উঠল : 'পেটের নীল বোতাম ছুঁলে কফি, লাল বোতাম ছুঁলে চায়ের লিকার। চিনি এবং দুধের প্যাকেট আমার বাঁ পকেটে।'

বলা বাহুল্য, সবই ইংরেজিতে লেখা। কর্নেল নীল বোতাম ছুঁতেই তার তলপেটের নীচে একটা ট্রে বেরিয়ে এল। তাতে একটা পেপার কাপ ভর্তি কফির লিকার। কর্নেল আবার বোতাম ছুঁলেন। আরেক কাপ কপি ট্রেতে পড়ল ঠকাস করে। তারপর রোবটের পকেট থেকে দুটো ছোট্ট দুধ আর দুটো চিনির কিউব ভরা প্যাকেট তুলে নিলেন। একটু হেসে বললেন—মাস্টার ব্লিক, তোমার খাদ্য আমার পকেটে আছে। দিচ্ছি।

রোবটের বুকের পর্দায় ফুটে উঠল লাল হরফে : 'শাস্তিস্বরূপ পাখিটাকে কিছু খেতে দেওয়া হবে না।'

রোবোটটা চলে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন-- মাস্টার ব্লিক, আমি নাচার ডালিং।

মাস্টার ব্লিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বিরসবদনে। একটু পরে সেই লোকটাই ফিরে এসে টেবিলের সামনের আসনে বসল। তারপর কালো চশমা খুলে একটু হেসে বলল— আশাকরি কোনো অসুবিধে হয় নি ?

কর্নেল বললেন— না। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে মাননীয় গৃহকর্তার পরিচয় কী ?

—আমি একজন বিজ্ঞানী।

নিশ্চয় তাই। কিন্তু তার বাইরেও আপনার একটা পরিচয় আছে।

- -তার আগে কি আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না কেন আপনাদের নিয়ে এলুম ?

—করছে। কিন্তু প্রথমে জানতে ইচ্ছে করছে আমরা কোথায় আছি ?

— কচ্ছের রান জলাভূমির এক দুর্গম দ্বীপে। লোকটা একটু হাসল আবার। —আপনাদের নিয়ে আসার কারণ, আপনারা একটা ডিম চুরি করেছিলেন !

কর্নেল আপত্তি করলেন-- চুরি কেন ? ডিমটা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম সিহোরা কেল্লার কাছে।

—কিন্তু একথা নিশ্চয় জানেন, না বলে অন্যের জিনিস নিলে সেটাই চুরি ?

—আসলে আমরা ওটা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু ভেবেছিলুম !

লোকটা চটে গেল।—প্রাকৃতিক বস্তুর জিনিস ? বাজে কথা বলবেন না।

কর্নেল বিনীতভাবে বললেন—অজ্ঞতার জন্য এ অপরাধ করে ফেলেছি। ক্ষমা চাইছি।

লোকটার মুখে গর্ব ফুটে উঠল।—যাই হোক, আমার দ্বিতীয় পরীক্ষাও সফল হয়েছে। পৌরাণিক গরুড়ের জন্ম সম্ভব হয়েছে। গতবছর যে গরুড়-

পাখির উদ্ভব ঘটেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কসমিক ঝড়ের তাণ্ডবে সে মারা পড়েছিল। এবার—

কর্নেল চমকে উঠে দ্রুত বললেন—পৃথিবীতে কসমিক ঝড়? সে তো মহাকাশের ঘটনা।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল—হ্যাঁ। সূর্যের কেন্দ্রে ওই ঝড় কোথা থেকে এসে ধাক্কা মারে। সূর্যের আয়তন বেড়ে যায়। কিন্তু গত একটা বছর ধরে লক্ষ্য করছি, এক বর্গমাইল আয়তনের একটা কসমিক ঝড় এসে পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আগের রাতেও ঝড়টা এসেছিল। তাই আমি এই দ্বিতীয় গরুড় পাখিটির জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলুম। তবে এ যে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ অবশ্য পাচ্ছিলুম। এর জন্মের আগে থেকে ভ্রূণকোষে ধ্বনিসংকেত পাঠানোর ব্যবস্থা করা ছিল এবারে।

—হুঁ, ওই ব্লিক্ ব্লিক্ ডাকটা।

—ঠিক ধরেছেন। আপনাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে।

—ওই শুনেই ওর নাম রেখেছি মাস্টার ব্লিক।

লোকটা হাসতে লাগল।—আপনি মশাই বড় রসিক দেখছি। মাস্টার ব্লিক!

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গীতে বললেন—কিন্তু কেন কসমিক ঝড় এসে পৃথিবীতে আঘাত হানছে—এবং বেছে-বেছে ঠিক সিহোরা এলাকায়? এ সম্পর্কে কি কিছু ভেবে দেখেছেন? আমাদের লোকাস্ট্ প্রজেক্টের ক্যাম্পে সব যন্ত্রপাতি অচল করে দিয়েছে ওই ঝড়। তাছাড়া তীক্ষ্ণ হুইসল্ আর একটা নীল আভা!

লোকটা গুম হয়ে কী ভাবল। তারপর বলল—আপনি লক্ষ্য করেছেন তাহলে। ঝড়টা মাঝে মাঝে এই দ্বীপেও হানা দেয়। ভাগ্যিস মাটির তলায় এবং বিশেষ নিরোধক ব্যবস্থা থাকায় আমার ল্যাবোরেটরি এখনও অক্ষত রয়েছে। এটা আসলে ষোলশতকে তৈরি পর্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাঁটি। মাটির তলায় এই ঘরটায় ওরা আরবসাগর থেকে বাণিজ্য জাহাজ লুঠ করে এনে সব দামী জিনিস লুকিয়ে রাখত।

কর্নেল হঠাৎ বললেন—আপনি জেনেটিক্স বিজ্ঞানী। ক্লোনিংতত্ত্বকে বাস্তবে সফল করতে পেরেছেন। তার প্রমাণ লুনি নদীর ধারে বেহোড় এলাকায় ফাটলের ভেতর ওই পঙ্গপাল! আরও প্রমাণ এই মাস্টার ব্লিক। কিন্তু কেন আপনি গোপনে গোপনে এসব করছেন?

—কেন? বিজ্ঞানীর চোখদুটো জ্বলে উঠল।—আপনাদের আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। মৃত্যুর আগে সব কথা জেনে যেতে পারবেন।

শুনে আমার মাথার খুলির ভেতরটা শূন্য হয়ে গেল এবং একটা ঠাণ্ডা ঢিল গড়িয়ে গেল যেন। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম। কর্নেল নিষ্পলক চোখে

তাকিয়ে রইলেন লোকটার দিকে।

সে নিষ্ঠুর মুখে আবার বলল—আর মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা আপনাদের আয়ু। কারণ আমার আরও একটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ার সাফল্য আপনাদের দেখিয়ে তাক লাগাতে চাই। সেই বিস্ময় নিয়েই আপনাদের মৃত্যু হোক।···

ধ্বংসের পরিকল্পনা

লোকটা প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। কিন্তু উন্মাদ বলে মনে হচ্ছিল তাকে। তার হাবভাবে ক্রমশঃ অপ্রকৃতিস্থ মানুষের আচরণ ফুটে বেরুচ্ছিল। সে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে চোখ কটমট করে আমাদের দিকে একবার তাকাল। তারপর চলে গেল কফিনটার কাছে। কাচের কফিনটার ঢাকনা খুলে সে ঝুঁকে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পাশের একটা প্রকাণ্ড কম্পিউটারের বোর্ডে আটকানো একটা স্প্রিংয়ের মতো কুণ্ডলীপাকানো তার টেনে কফিনের ভেতর ঢোকাল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না কী সে করছে। একটু পরে সে ঢাকনা খোলা রেখেই অন্য একটি কম্পিউটারের সামনে গেল। পর্দায় লাল-নীল আলোর রেখা জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে। বিচিত্র আঁকিবুকি ফুটে উঠছে। সে খুব মন দিয়ে সেগুলো লক্ষ্য করতে থাকল।

কর্নেলের দিকে তাকালুম। এই বৃদ্ধও কম প্রতিভাধর নন। বহু সাংঘাতিক বিপদের মুখে ওঁর বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে অবাক হয়েছি। কিন্তু তাঁকেও এখন অসহায় মনে হচ্ছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছিলুম। মাস্টার ব্লিক কখন থেকে ছবির মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই চোয়াল থেকে বেরুনো শুঁড় দুটো খাড়া হয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ফিরে এসে চেয়ারে বসল। ঘড়ি দেখে গম্ভীরভাবে বলল···আপনাদের মৃত্যুর ঘড়ি চালু করে দিয়ে এলুম। আর একাত্তর ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট তের সেকেন্ড বাকি।

কর্নেল শান্তভাবে বললেন—আপনার এ ক্লোনিংয়ের উদ্দেশ্য কী।

—প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল সৃজনমূলক। এখন ধ্বংসমূলক।

—আপনি কি কারুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছেন?

—অবশ্যই। আমার প্রতিশোধের পরিকল্পনা ত্রিমুখী। বলে সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক শিট কাগজ বের করল। কলম টেনে নিল সুদৃশ্য কলমদানি থেকে। কাগজে আঁক কেটে বলল—এই দেখুন আমার ধ্বংসের অভিযান কী ভাবে শুরু হবে! প্রথম পয়েন্ট হল ডেজার্ট লোকাস্ট—মরু পঙ্গপাল। এদের কোনো পেস্টিসাইডস প্রয়োগ করেও মারা যাবে না। কারণ এদের শরীরে প্রতিরোধ শক্তি প্রচণ্ড। মার্চ-এপ্রিলের প্রথমে এরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের শস্যক্ষেত্রে গিয়ে হানা দেবে। খারিফ শস্য আর ঘরে উঠবে না। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সরকারের উদ্বৃত্ত খাদ্য ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে রিলিফের কাজে।

তারপর আবার পঙ্গপালের ব্রিডিং এবং আরও শক্তিশালী পঙ্গপাল আগামী শরতকালে পূর্বভারতে গিয়ে হানা দেবে। একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিদেশের কাছে খাদ্যের জন্য হাত পাততে হবে।

নিষ্ঠুর হেসে আবার কাগজে আঁক কেটে বলল—এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট গরুড়পাখির অভিযান। এই পাখির নখের ভেতরে জৈব বিষের থলি রয়েছে। ঠিক একমাস বয়স হলে এ পাখির নখের ভেতরকার বিষের থলিদুটো ফেটে যাবে এবং যেদিকে উড়ে যাবে সে সেদিকেই বিষ ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে। বিষের কণা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেবে এক প্রজাতির সাংঘাতিক ভাইরাস! সেই ভাইরাস ব্যাপক রোগ ছড়াবে—যার কোনো ওষুধ এখনও অনাবিষ্কৃত।

এরপর কাগজে একটা গোল্লা আঁকল বিজ্ঞানী। বলল—এটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একজন মানুষ। একজন জীবিত মানুষ থেকে—ওই যে দেখছেন কফিনে শুয়ে আছে—তার দেহকোষ থেকে—তৈরি হবে পৃথক প্রজাতির এক মানুষ, যার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের যত মিল, অমিলও তত। এই কফিনের লোকটা এদেশের একজন ঝানু রাজনীতিক। তাকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি। জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা করে এসে সে তার বাড়ির ছাদের ফুলবাগানে একলা বসে মদ্যপান করছিল। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার।

খিকখিক করে হাসতে লাগল বিজ্ঞানী। কর্নেল বললেন—এই রাজনীতিকের দেহকোষ থেকে কি পৃথক প্রজাতির রাজনীতিক সৃষ্টি করতে চাইছেন?

—ঠিকই ধরেছেন। আপনি বুদ্ধিমান বলেই তো আপনার মৃত্যুর আগে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত মনে করেছি। আমার সৃষ্ট নতুন প্রজাতির রাজনীতিক মানুষ হবে সব স্বাভাবিক রাজনীতিকের এক মূর্তিমান সমবায়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার জন্যই এমন একজন রাজনীতিওয়ালা দরকার কি না বলুন? আসলে যে প্রজাতির রাজনীতিওয়ালা পৃথিবীতে আগামী যুগে স্বাভাবিক নিয়মে আবিষ্কৃত হবে, আমি জেনেটিক্সের ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তাদের একজন অগ্রগামীকে এখনই সৃষ্টি করতে চাই। কারণ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের আগেই পৃথিবী থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে যাক—এই আমি চাই।

—মানুষের ওপর এত ক্রোধ কেন আপনার?

একটু চুপ করে থাকার পর লোকটা বলল—প্রথমে মানুষের ওপর ক্রোধ ছিল না, ছিল দেশের সরকারের ওপর। পরে ভেবে দেখলুম, মানুষই তো সরকার গড়ে কোথাও প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে, কোথাও নীরব সমর্থনে কিংবা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ থেকে। দেশের মানুষের যেমন প্রকৃতি, তাদের সরকারও হয় তেমন প্রকৃতির।

—সরকারের ওপর আপনি ক্রুদ্ধ কেন?

—তাহলে গোড়ার কথাটা বলতে হয়।

—বলুন। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

—আমি ছিলুম প্রতিরক্ষা গবেষণা দফতরের একজন সহকারী বিজ্ঞানী। রাসায়নিক যুদ্ধের প্রতিরোধ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলুম। সে আজ পনের বছর আগের কথা। আমি যার অধীনে কাজ করছিলুম, সেই লোকটার বিজ্ঞানে একটা ডক্টরেট ছিল বটে, আদতে সে ছিল হাড়ে হাড়ে একজন ব্যুরোক্রাট স্বভাবের লোক। অকর্মার ধাড়ী। এক মন্ত্রী আত্মীয়ের জোরে আমার মাথার ওপর বসেছিল। আমি রাসায়নিক যুদ্ধের প্রতিরোধ হিসেবে জেনেটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম। ক্লোনিংতত্ত্বকে বাস্তবে সফল করার কথা ভাবছিলুম। বিভিন্ন প্রতিরোধস্বভাবী ভাইরাসের কোষ থেকে ক্লোনিং করে এক নতুন প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারলে রাসায়নিক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ তাকে দিয়ে হজম করানো যায়। আপনি নিশ্চয় খবরে পড়েছেন, সমুদ্রের জলে পেট্রল ট্যাংকার থেকে পেট্রল পড়ে জলদূষণ ঘটে এবং সেই পেট্রল নিঃশেষে খেয়ে ফেলে সমুদ্রকে দূষণমুক্ত করবে, এমন একরকম ভাইরাস আমেরিকার এক বাঙালী বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেছেন?

— হ্যাঁ। পড়েছি।

— ঠিক তেমনি। কিন্তু আমার বস ভদ্রলোক আমার সমগ্র গবেষণা ও ফলাফল নিজের নামে প্রচার করলেন। আমি প্রতিবাদ করায় আমাকে সাসপেন্ড করলেন, তাই নয়—গুণ্ডা দিয়ে শাসালেন যে যদি এ নিয়ে আমি হইচই করি, আমার প্রাণ যাবে। আমি জেদী মানুষ। প্রধানমন্ত্রীকে সব লিখে জানাব ঠিক করলুম। কিন্তু কীভাবে খবর পেয়ে শয়তানটা অন্য চক্রান্ত করল। আমি পাকিস্তান সরকারকে নাকি কেমিকেল ওয়ারফেয়ার রেজিস্ট্যান্স প্রজেক্টের মূল্যবান নথি পাচার করে দিয়েছি! আমি নাকি গুপ্তচর! বেগতিক দেখে আমি গাঢাকা দিলুম! কারণ আমি জানি, এই সাংঘাতিক অপরাধে আমার চরমদণ্ডও হতে পারে!

—কিন্তু আপনি সে অপরাধ করেন নি।

—না। তারপর আমাকে না পেয়ে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে ধরে নিয়ে গেল। আমাদের ঘরদোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। তবু আমি ধরা দিলুম না। কারণ আমার গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্য বাকি তখনও। তারপর গত পনেরটা বছর ধরে আমি লড়াই করে গেছি বাকি কাজ শেষ করার জন্য। অর্থসংগ্রহ করেছি চম্বলের ডাকাতদের দলে ভিড়ে। ছদ্মবেশে ছদ্মনামে বিদেশে গেছি। কচ্ছ উপকূলের স্মাগলারদের সাহায্যে বিদেশী যন্ত্রপাতি আনিয়েছি। পর্তুগীজ জলদস্যুদের এই গোপন ডেরার কথা আমি নানা সূত্রে জেনেছিলুম। আমার একটা গোপন গবেষণাগারের দরকার ছিল। পেয়ে গেলুম এখানে, তারপর-

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—আপনার বাবা-মা কি এখনও বন্দী?

গলার ভেতর বলল—না। দু'বছর আগে তাঁরা জেলেই মারা গেছেন।

—আপনার জীবন আশ্চর্য রোমাঞ্চকর। আপনার কৃতিত্বও বিস্ময়কর। কর্নেল প্রশংসা করে বলতে থাকলেন। —বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় আপনার প্রতিভার সাক্ষর দেখতে পাচ্ছি। ওই স্পাইডারশিপও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি!

—আমি ফ্লাইং সসারের অনুকরণে ওটা তৈরি করেছি। খেলায় ডিসকাস থ্রোয়িং নিশ্চয় দেখেছেন। এই গাড়িটা ডিসকাসের গড়নে তৈরি। তাই সামান্য স্পিড দিলে স্পিড বহুগুণ বেড়ে যায়। আকাশে, জলে বা স্থলে সমান বেগে ছুটতে পারে ছুঁড়ে মারা ডিসকাসের মতো।

—কিন্তু এবার আপনি কেন প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করছেন না? যদি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনার পক্ষ থেকে গিয়ে সব কথা খুলে বলব।

হাত তুলে বলল—কোনো দরকার নেই। বাবা-মায়ের মৃত্যুর খবর যেদিন কাগজে পড়েছি, সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছি—আমি দেশটাকে ধ্বংস করে দেব। দেশটা গলেপচে গেছে। এর মৃত্যু হওয়া দরকার।

শ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর—আসছি বলে লিফটের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে লিফটের দরজা খুলল এবং ভেতরে ঢুকে ফের সুইচ টিপল। লিফটটা বিদ্যুৎগতিতে ওপরে উঠে গেল।...

ইন্দ্রনীলের আবির্ভাব

মাস্টার ব্লিক একটু আগে থেকে উসখুস করছিল। এতক্ষণে দুবার ব্লিক ব্লিক করে উঠল। কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—কী হয়েছে মাস্টার ব্লিক?

পাখিটা হঠাৎ ট্যাঙস ট্যাঙস করে এগিয়ে গেল। তারপর প্রথম কম্পিউটারের কাছে গিয়ে টি ভি পর্দার দিকে তাকিয়ে ফের ব্লিক ব্লিক করতে থাকল। এবার পর্দার দিকে চোখ গেল আমাদের। কর্নেল বললেন—বুঝেছি! মাস্টার ব্লিক তার স্রষ্টাকে পর্দায় দেখতে পেয়েছিল।

পর্দায় আবছা জঙ্গলের দৃশ্য ফুটে উঠেছে এবং বিজ্ঞানী প্রবরের আঙুলের ডগায় আলো জ্বলছে। সেই আলোতেই রাতের জঙ্গল একটু-একটু আভাসিত হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে? বুঝতে পারছি, ওপরকার জঙ্গল তথা দ্বীপের দৃশ্য এখানে বসেই দেখা যায় এবং বিজ্ঞানী লোকটা এভাবেই নজর রাখে, কেউ এ দ্বীপে এসে পড়েছে কি না। সে ঢালু পথ ধরে বেলাভূমিতে নামল। তারপর জলের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের তর্জনী তুলে কী ইশারা করতে থাকল। একটু পরে জল থেকে ভেসে উঠল সেই হলুদরঙের স্পাইডারশিপ। কর্নেল বললেন—বুঝতে পারছ জয়ন্ত? বাঁ-হাতের আঙুলে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে। তার সাহায্যে গাড়িটা ডেকে আনলেন ভদ্রলোক।

রাগ করে বললুম—ভদ্রলোক বলবেন না। সিহোরার লোকে ওকে দানো বলে। লোকটা সত্যি একটা দানো।

স্পাইডারশিপে ঢুকে গেল সে। তারপর মুহূর্তেই গাড়িটা জলমাকড়সার মতো বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল অন্ধকারে।

হঠাৎ কর্নেল বললেন—আরে। এ আবার কে?

স্ক্রিনে আবছা কালো একটা মূর্তি ফুটে উঠেছে। মূর্তিটা পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে কেল্লাবাড়ির দিকে। একটু পরে ওপরকার ঘরের মেঝেয় তার সিলুয়েট মূর্তি দেখা গেল। বুঝলুম, এই কম্পিউটারাইজড টিভির স্বয়ং চালিত অ্যান্টেনা সবরকম মুভিং অবজেক্টকে কেন্দ্র করে ছবি পাঠায়। মূর্তিটা বসে পড়েছে এবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পর্দা থেকে মূর্তিটা মুছে গেল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর লিফটের সুড়ঙ্গের কাছে গেলেন। তখনি ব্লিক খুট খুট শব্দে একটা রোবোট কোত্থেকে এসে কর্নেলের কোট খামচে ধরল যান্ত্রিক হাতে। আমি আঁতকে উঠলুম। মাস্টার ব্লিক এসে রোবোটটার পিঠে জোরে ঠোক্কর মারল। ঠনাৎ করে শব্দ হল। কর্নেল রোবটটাকে দেখছিলেন। হাত বাড়িয়ে তার মাথার দিকে আনতেই রোবোটটা অন্য হাতে কর্নেলের হাতটা চেপে ধরল। কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! জয়ন্ত! ওর মাথার লাল বোতামটা জোরে টিপে দাও।

দৌড়ে গিয়ে লাল বোতামে চাপ দিলুম। তখনি রোবোটের দুটো হাত ঝুলে পড়ল। কর্নেল একটু হেসে বললেন—জাপানী ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রোবোট-গার্ড। টোকিওর একটা কারখানায় এই প্রহরীরোবট গতবছর দেখে এসেছিলুম। ভাগ্যিস, কন্ট্রোলসিস্টেমটা জেনে নিয়েছিলুম। কাজে লাগল। যাই হোক, দেখি লিফটটা নামানো যায় নাকি।

বললুম—ওপরে গিয়ে চাবি এঁটে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে গেছে হয়তো।

—দেখা যাক। বলে কর্নেল খুঁটিয়ে সুড়ঙ্গের ফ্রেমটা লক্ষ্য করতে থাকলেন। এটা-ওটা টেপাটেপি করেও কোনো কাজ হল না।

তখন কর্নেল বললেন—নিশ্চয় কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে কোথাও। একটা মাদার কন্ট্রোল সিস্টেম না থেকে পারে না। চলো তো, খুঁজে দেখি শিগগির!

খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হলুম দুজনে। মাস্টার ব্লিক নিষ্ক্রিয় রোবোটটার গায়ে ঠোক্কর মারছে, কামড়ে ধরছে। হঠাৎ কর্নেল বললেন—নিশ্চয় সেটা ওর চেয়ারে বা টেবিলের কোথাও থাকা উচিত।

বলে টেবিলের কাছে গেলেন। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে একটা ছোট্ট বাক্স পেয়ে গেলেন। বাক্সটার সঙ্গে তার পরানো আছে একগুচ্ছের। টেবিলে রেখে সংকেত চিহ্ন দেখতে দেখতে একটা খুদে সুইচে চাপ দিলেন। ঘস্‌ করে একটা শব্দ হল। তারপর আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, লিফটটা নেমে এল। কর্নেল বললেন—আপাতত এখনই এখান থেকে বেরুনো দরকার।

লিফটে মাস্টার ব্লিককেও চাপানো হল। রোবোটটা দাঁড়িয়েই রইলো তেমনি। আমরা ওপরে উঠে গেলুম। লিফটের আলোয় দেখলুম সেই মূর্তিটা একজন মানুষের। পরণে শতচ্ছিন্ন পোশাক। ক্লান্ত চেহারা। চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আমাদের দেখে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। কর্নেল তার সামনে গিয়ে বলে উঠলেন—আপনি কি ইন্দ্রনীল রায়? মাথা নেড়ে একটু হাসবার চেষ্ট করল সে।

—শিগগির আমাদের সঙ্গে আসুন। জয়ন্ত, ওঁকে একটু সাহায্য করো। আমাদের এখনই কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার।

তিনজনে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বেলাভূমিতে নামলুম। এখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। আকাশে নক্ষত্র ঝিকমিক করছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। বেলাভূমি ধরে আমরা দূরের দিকে হেঁটে চললুম। সেইসময় কর্নেল বলে উঠলেন—ওই যাঃ! সেই টিভিটা বন্ধ করে আসা উচিত ছিল। ওটার স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টেনা আমাদের গতিবিধি দেখিয়ে দেবে।

বললুম—আমরা যদি না নড়াচড়া করে কোথাও বসে থাকি, তাহলে বোধ করি টিভি পর্দায় আমাদের ছবি ফুটে উঠবে না। আমি লক্ষ্য করেছি, ওই লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছিল, তখনই পর্দায় কোনো ছবি উঠছিল না। মুভিং অবজেক্টের ছবিই ওতে ফোটে।

কর্নেল বললেন—শুধু মুভিং অবজেক্ট নয় জয়ন্ত। অবজেক্ট কোনো প্রাণীর হওয়া চাই। মাস্টার ব্লিক, সাবধান! এখনকার মতো নড়বে না। ব্লিক ব্লিক করবে না। কেমন?

মাস্টার ব্লিক বলল—ব্লিক!

—চুপ! কর্নেল থাপ্পড় তুলে বললেন।—স্পিকটি নট। তারপর তাকে কোলে তুলে নিলেন।

ডাইনে পাথরের স্তুপ আবছা নজরে আসছিল। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে ইন্দ্রনীল বলল—এটা কী পাখি?

কর্নেল বললেন—পৌরাণিক গরুড়পক্ষী। আর কথা নয়। নড়াচড়া নয়। এখানে চুপচাপ বসা যাক।

রহস্যময় নীল কুয়াশাবৃত্ত

মাথার ওপরে রাতের আকাশের নক্ষত্র ঢেকে একটা নীলচে রঙের বিশাল বৃত্ত নেমে আসতে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল! ওটা কী?

কর্নেল দেখে বললেন—মুখ গুঁজে থাকো সবাই। চোখ বন্ধ রাখো। সাবধান!

শনশন শব্দে তীক্ষ্ন হুইসল। তারপর চারদিক হাল্কা নীল আলোয় ভরে

গেল। সেই সঙ্গে শুরু হল প্রলয় কাণ্ড। প্রচণ্ড ঝড় আমাদের ধাক্কা মেরে নিচের বেলাভূমিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে ঝুঁকে আমরা বসে রইলুম।

কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন—মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সিহোরা গ্রামে দেখেছি মানুষের তৈরী যা কিছু জিনিসের ওপরই এই অদ্ভুত ঝড়ের হামলা। পালিত পশুও অবশ্য মারা পড়েছিল দেখেছি। সম্ভবত মানুষের সংসর্গে বাস করে বলে তাদের ওপরও হামলা হয়েছে। কিন্তু তত বেশি ক্ষতি করা যেন এ ঝড়ের উদ্দেশ্য নয়। জয়ন্ত, মহাজাগতিক কোনো বুদ্ধিমান সত্তা যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই হামলা করছে।

বললুম—আমারও তাই মনে হচ্ছে! কিন্তু বেছে বেছে শুধু সিহোরা এলাকা। আর রানের এই দ্বীপে কেন?

ইন্দ্রনীল বলল—এবার আমার কথা শুনুন। পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে হ্যাং গ্লাইডারে উড়ে আসতে আসতে হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় রাজস্থানের থর মরুভূমির আকাশে চলে গিয়েছিলুম। গ্লাইডারে কন্ট্রোল সিস্টেম ছিল। বাতাসের জোর কমলে আবার দক্ষিণে ঘুরিয়ে দিলুম গ্লাইডার। বেলা পড়ে এসেছিল। একসময় ম্যাপ এবং চার্ট মিলিয়ে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে দেখি, আমি গুজরাটের দিকে চলেছি। তারপর আবিষ্কার করলুম কন্ট্রোল সিস্টেম অকেজো হয়ে গেছে। কিছুতেই গ্লাইডারের গতিপথ বদলাতে পারলুম না। ব্যাটারি পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আলো নিভে গেছে। অসহায় হয়ে ভেসে চলেছি আকাশে। যে কোনো মুহূর্তে আশংকা করছি, পাহাড়ে ধাক্কা লেগে গুঁড়ো হয়ে যাব। হঠাৎই দেখি গ্লাইডার নেমে চলেছে। ডানা দুটো নব্বই ডিগ্রি বরাবর কাত হয়েছে। পালকের মতো নেমে পড়ল আমার হ্যাং গ্লাইডার। বেল্ট খুলে নেমে এলুম। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না। কম্পাসও অচল। তাই দিক নির্ণয়ের জন্য আকাশে ধ্রুবতারা খুঁজতে লাগলুম। তারপর অবাক হয়ে দেখি, আমার ওপর—একটু আগে যে নীল কুয়াশাবৃত্ত নেমে এসেছিল, ঠিক তেমনি একটা জিনিস ভেসে আছে। তারপর আমি ভীষণ চমকে গেলুম। বলতে পারেন, আমি একটা গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, আমার প্রতিটি কথা সত্য।

কর্নেল বললেন—না, না। বলুন আপনি!

—আমি দেখলুম যেন চুম্বকের টানে সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছি। একটুও ওজন নেই শরীরের। মাধ্যাকর্ষণ টের পাচ্ছি না। নীল কুয়াশাবৃত্তটার কাছাকাছি পেঁাছে টের পেলুম ওটা আমাকে যেন ঝুলন্ত অবস্থায় নিয়ে চলেছে। আঁতকে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, চোখ খুলে দেখি জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। অন্ধকার হলেও এটা জঙ্গল, তা বুঝতে পারছিলুম। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর আশ্রয়ের খোঁজে হাঁটতে থাকলুম। কতবার

আছাড় খেয়ে কাঁটায় পোশাক ছিঁড়ে ফালাফালা হল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লাল বাতি উঁচুতে জ্বলে উঠে তক্ষুনি নিভে গেল। অনুমান করে সেই-দিকে ওই ভাঙা বাড়িটায় হাজির হয়েছিলুম। তারপর আপনারা—

কর্নেল বললেন— চুপ।

পশ্চিমের জলাভূমিতে লাল নীল হলুদ আলোর বিন্দু পর্যায়ক্রমে জ্বলতে জ্বলতে কী একটা এগিয়ে আসছিল। সেটা তীরে এসে পৌঁছুলে দেখলুম স্পাইডারশিপ এতক্ষণে ফিরল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন—বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ফিরে এলেন। ল্যাবরেটরির দশা দেখে আশাকরি রাগের চোটে আরও পাগল হবেন। এস জয়ন্ত, আসুন ইন্দ্রনীলবাবু! আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখা দরকার। সুড়ঙ্গপথ আমরা খুলে রেখেছিলুম। কাজেই মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড় ওঁর ল্যাবরেটরির সব যন্ত্র নিষ্ক্রিয় করে রেখে গেছে।

বেলাভূমির ধারে পাথরেরর আড়ালে আমরা চুপিচুপি এগিয়ে চললুম। স্পাইডারশিপটা মাকড়সার মতো দুদিকে ঠ্যাং বের করে তরতরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। সেই হাল্কা হলুদ আলোয় হলুদরঙের স্পাইডারশিপকে থামতে দেখলুম জঙ্গলের ভেতরে। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন—জয়ন্ত, মাস্টার ব্লিককে ধরো, আশা করি আর তোমাকে ঠোকরাবে না।

শ্রীমান রামগরুড়ের ছানা আমার বুকে সেঁটে রইল। কর্নেল পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন। একটু পরে দেখি, উনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ঝোপের আড়ালে গিয়ে ওত পেতে বসলেন। আমরাও একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে বসে আছি। চাঁদের আলোটা আবছা হলেও ওই জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীকে গাছপালার ভেতরে থেকে দৌড়ে বেরুতে দেখা গেল। স্পাইডার-শিপের কাছে আসতেই কর্নেল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে বলল—কী ব্যাপার?

কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম—জয়ন্ত! তোমরা এখানে চলে এস।

গিয়ে দেখি কর্নেল লোকটার পিঠে বসে আছেন। মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক করতে করতে আমার কোল থেকে নেমে কর্নেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, ওখানে ওই কালো জিনিসটা পড়ে আছে। সাবধানে তুলে আমাকে দাও। ওঠা লেসার পিস্তল।

মারাত্মক অস্ত্রটা কুড়িয়ে কর্নেলকে দিলাম। তখন কর্নেল ওর পিঠ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মিঃ এক্স! এবার ভালমানুষের মতো উঠে দাঁড়ান। দুঃখ করে লাভ নেই। যা বলছি, লক্ষ্মী ছেলের মতো শুনুন!

সে দুহাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। কর্নেল তাকে টেনে ওঠালেন! ফের বললেন—মিঃ এক্স। আমাদের সিহোবা নিয়ে চলুন।

—আমি মিঃ এক্স নই। সজ্জন সিং রচপাল।

—মিঃ রচপাল! চলুন আমরা সিহোরা যাই। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ স্খালনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সরকার যাতে আপনার বিস্ময়কর গবেষণায় সাহায্য করেন, সে চেষ্টাও আমি করব। দেখলেন তো মিঃ রচপাল, আপনার ধ্বংস পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য যেন প্রকৃতিই পাল্টা ব্যবস্থা রেখেছেন? আপনি প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। আপনি আশাকরি বুঝতে পেরেছেন, ঈশ্বর কি না জানি না—তাকে আমি ঈশ্বরও বলব না—কী এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি এখনও যেন সারা সৃষ্টিকে নজরে রেখেছে। মহাজাগতিক চৌম্বক প্রবাহ তারই এক প্রহরী হয়তো।

সজ্জন সিং রচপাল রুমালে চোখ মুছে বললেন—ও কে.। এক মিনিট, স্পাইডারশিপের ইউরেনিয়াম জ্বালানি কতটুকু আছে দেখে নিই।

বলে স্পাইডারশিপের ওপরকার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর আমাদের বোকা বানিয়ে চোখের পলকে প্রকাণ্ড চাকতির মতো হলুদ মাকড়সা গাড়িটা সাঁই করে আকাশে উড়ে গেল।

তারপর ঘটল ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকাশে একটা প্রচণ্ড লাল আগুনের ভাটার মতো ওটা পাক খেতে থাকল। তারপর তীব্র সাদা আলোর ঝলকানি দেখতে পেলুম। কর্নেল বললেন—সর্বনাশ!

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা ধরে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। তেমনি সোনালী জ্যোৎস্না বুকে নিয়ে আকাশ নির্বিকার। নক্ষত্র ঝিলমিল করছে। টুকরো চাঁদটাও তেমনি নিস্পন্দভাবে ঝুলে আছে। কোথাও রাতপাখি ডাকল।

মাস্টার ব্লিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তিনবার ব্লিক করে ডেকে সে দৌড়ুনো শুরু করল জলের দিকে। কর্নেল চেঁচিয়ে তাকে ডাকলেন—মাস্টার ব্লিক! মাস্টার ব্লিক!

হতচ্ছাড়া পাখিটা জ্যোৎস্নাভরা আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।…

উপসংহার

রান এলাকা পাকিস্তানের সীমান্তে। তাই দুর্গম জলাভূমি হলেও কোথাও কোথাও ভারতীয় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি রয়েছে। দুদিন দুরাত্রি পরে প্রতিরক্ষা উপকূল বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার দৈবাৎ ওই এলাকায় গিয়ে আমাদের দেখতে পায়। আমরা তিনটি মানুষ তখন ক্ষুৎপীড়িত এবং দুর্বল। হেলিকপ্টারটি আমাদের সিহোরা পেঁছে দেয়। গিয়ে দেখি, বুদ্ধিমান পৃথ্বীজিৎ সিং সেই পঙ্গপালের আস্তানার ফাটলগুলোকে কংক্রিট দিয়ে সীল করে দিয়েছেন।

শুধু ভাবনা ছিল রামগরুড়ের ছানাটার জন্য। তার দুপায়ের তলায় মারাত্মক বিষাক্ত ভাইরাসের থলি আছে। রান এলাকায় তার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে কর্নেল ইন্দ্রনীল ও আমাকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলেন। কিছুদিন পরে কাগজে খবর বেরুল, রানের একটি দ্বীপে মাস্টার ব্রিককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাকে থর মরুভূমির এক দুর্গম এলাকায় গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

আর মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড়ের রহস্যমোচন হয়েছিল আরও দুমাস পরে। ভানুপ্রতাপের কেল্লার ওখানে সেই প্রাচীন স্তম্ভের কাছে খুঁড়ে মাটির তলায় শক্তিশালী চুম্বক পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি আরেকটি চুম্বক পাওয়া যায় সজ্জন সিং রচপালের ভুগর্ভস্থ ল্যাবরেটরিতে। সজ্জন সিং রচপাল সম্ভবত চুম্বকটি সিহোরার ওই প্রাচীন অবজারভেটরি এলাকায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। দুটি চুম্বককে অজস্র টুকরো করে দেশের বিভিন্ন জায়গার যাদুঘরে রাখা হয়েছে। রাজনীতিক ভদ্রলোককে বাঁচানো যায় নি। তবে তাঁর বয়সও ছিল 82 বছর। শুধু ইন্দ্রনীলের ব্যাপারটা বোঝা যায় না। কর্নেলের মতে, মহাজাগতিক কোনো দুর্জ্ঞেয় শক্তি বেচারীকে নিয়ে একটু কৌতুক করেছিল। এ সেই ডোবার ব্যাঙ আর দুষ্টু ছেলেদের ঢিল ছোঁড়ার গল্পের মতো। ওদের কাছে যা খেলা, ব্যাঙদের কাছে তা প্রাণান্তকর। পৃথিবীর মানুষ তো মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙের চেয়ে অকিঞ্চিৎকর প্রাণী।

সে যাই হোক, মাস্টার ব্রিক অর্থাৎ সেই রামগরুড়ের ছানাটির জন্য এখনও আমার খুব দুঃখ হয়। ওর লাল মাথাটিতে যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকত।...

ঝুমগড়ের পিশাচরহস্য

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হাতে নস্যির কৌটো। হঠাৎ বলে উঠলেন,—অ্যাঃ! পিচাশ!

হাসি চেপে বললাম,– কথাটা পিশাচ হালদারমশাই!

উত্তেজিত হলেই ঢ্যাঙা গড়নের এই গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও ঢ্যাঙা হয়ে ওঠেন যেন। গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপে। বললেন,—মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিসে সার্ভিস করছি। অন্ধকারে বনবাদাড়ে শ্মশানেমশানে ঘুরছি। কখনও পিচাশ দেখি নাই। কর্নেলস্যার, দেখেছেন নাকি?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা গাব্দা পুরনো বই পড়ছিলেন। দাঁতের ফাঁকে আটকানো চুরুটের নীল ধোঁয়া তাঁর চকচকে টাকের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে খেলা করছিল। ঋষিসুলভ সাদা দাড়িতে একটুকরো চুরুটের ছাই আটকে ছিল। মুখ তুলতেই তা খসে পড়ল। বললেন, —কী হালদারমশাই?

—পিচাশ!

—নাহ্। দেখিনি। তবে শুনেছি পিশাচ নাকি শ্মশানের আশেপাশে থাকে। মড়া খায়।

ধুমগড়ের পিচাশ ব্যাবাক একটা মড়া খাইয়া ফ্যালাইছে।—হালদারমশাই আবার একটিপ নস্যি নিলেন। উত্তেজনার সময় দেশোয়ালি ভাষায় কথা বলাও ওঁর অভ্যাস। বললেন ঃ জয়ন্তবাবুগো পেপার না লিখলে কথা ছিল। ছয় লক্ষ সার্কুলেশন। তাই না জয়ন্তবাবু?

বললাম,—আজ রোববারে ছ লাখ। অন্যদিন চার লাখ। কিন্তু দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ওই খবরটা মোটেও এক্সক্লুসিভ নয়। নিউজ এজেন্সির পাঠানো খবর। কাজেই এ খবরকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। আসলে পাতা ভরানোর জন্য অনেক সময় বাজে খবরও ঢোকাতে হয়। আবার সাংবাদিকরাও মাঝেমাঝে রাজনীতির কচকচি থেকে পাঠকদের রিলিফ দিতে মজার-মজার খবর তৈরি করেন। বিশেষ করে আজ রোববার ছুটির দিনে পাঠকদের একটু আনন্দ দেওয়া মন্দ কী?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—জয়ন্তের কথায় কান দেবেন না হালদারমশাই! ধুমগড়ের শ্মশানে সত্যিই পিশাচের ডেরা আছে। পিশাচটা একটা মড়ার পেট চিরে নাড়িভুঁড়িও খেয়েছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যথারীতি 'যাই গিয়া' বলে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম,—সর্বনাশ! হালদারমশাই সত্যিই ধুমগড়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—গেলে একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। তুমিও ওঁর সঙ্গ ধরলে পারতে।

—কী আশ্চর্য ! আপনি এই গাঁজাখুরি খবরে বিশ্বাস করেন ?

—করি বৈকি । বিশ্বপ্রকৃতিতে রহস্যের কোনও শেষ নেই ডার্লিং !

—কর্নেল ! আপনি কী বলছেন ? পিশাচ-টিশাচ মানুষের আদিম বিশ্বাস । কুসংস্কার মাত্র ।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু একটু হেসে বললেন,—তুমি ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত ! ক্রোম্যাগনন মানুষ এবং হোমো সেপিয়েন—সেপিয়েন অর্থাৎ আধুনিক মানুষের মধ্যেকার পর্যায়ে অবস্থা কী ছিল, এখনও বিশেষ জানা যায়নি । তাই মিসিং লিংক কথাটা বলা হয় । কে বলতে পারে পিশাচ সেই মিসিং লিংক নয় ? বিশেষ করে ধুমগড় জায়গাটা আমি দেখেছি । পাহাড় জঙ্গল নদী আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহস্যময় অনেক কিছুই থাকতে পারে । ওখানকার শ্মশানটাও ঐতিহাসিক ।

কর্নেল বইটা টেবিলে রাখলেন । এতক্ষণে চোখে পড়ল, মলাটে সোনালি হরফে লেখা আছে : 'ধুমগড়ের রাজকাহিনী ।' বললাম,—তা হলে বোঝা যাচ্ছে, পিশাচের গল্প এই বইটাতেও আছে ।

কর্নেল হাসলেন,—নাহ্ । এটা ধুমগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কাহিনী । ১৮৯০ সালে রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের লেখা পারিবারিক ইতিহাস ।

—ব্যাপারটা সন্দেহজনক কিন্তু ।

—কেন ?

—কাগজে ধুমগড়ে পিশাচের খবর বেরুল, আর বইটাও আপনার হাতে চলে এল ।

ষষ্ঠীচরণ আরেক দফা কফি আনল । কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, —বইটা আমার হাতে উড়ে আসেনি । গত মাসে ধুমগড় গিয়েছিলাম অর্কিডের খোঁজে । ওইসময় ওখানকার রাজাদের বংশধর রণজয় সিংহের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । কথায়-কথায় বংশের লম্বাচওড়া গল্প শোনালেন । গল্পগুলো যে সত্যি, তা প্রমাণের জন্য এই বইটা আমাকে পড়তে দিলেন । আমি উঠেছিলাম নদীর ধারে ফরেস্ট-বাংলোয় । সেখানে বিদ্যুৎ নেই । হেরিকেনের আলোয় বইটা পড়তে শুরু করলাম । সকালে ফেরত দেবার কথা ছিল । হঠাৎ রণজয় সিংহ রাতদুপুরে গিয়ে হাজির । ভেবেছিলাম পারিবারিক ইতিহাসের বইটা নিয়ে কেটে পড়েছি কিনা দেখতে এসেছেন । কিন্তু তা নয় । ভদ্রলোক চুপিচুপি একটা অদ্ভুত কথা বললেন । বইয়ের ভেতর একটা ধাঁধা আছে । ওটার জট ছাড়াতে পারলে আমাকে সাধ্যমতো পুরস্কৃত করবেন । ধাঁধাটা হল :

পাষণ্ডের পা
কভু ধরিস না
মস্তকে ঘা
কী জ্বলে রে বাবা ।।

কর্নেল কফিতে আবার চুমুক দিলেন। বললাম,—সেকেলে লোকেরা শুনেছি কথায়-কথায় ধাঁধা আওড়াতেন। কিন্তু এ ধাঁধাটা একেবারে গোলকধাঁধা।

আমি হেসে উঠলাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন,—কী বললে? কী বললে? গোলকধাঁধা?

—হ্যাঁ। গোলকধাঁধাই বলা চলে।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করে সাড়া পেয়ে বললেন,—সঞ্জয়বাবু! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। আপনার জ্যাঠামশাই,…চলে গেছেন?…ঠিক আছে। রাখছি।

টেলিফোন রেখে উজ্জ্বল হেসে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললেন, —ব্রিলিয়ান্ট, ডার্লিং ব্রিলিয়ান্ট! এ বেলা আমার ঘরে তোমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন।

অবাক হয়ে বললাম—ব্যাপার কী? হঠাৎ আমার এত প্রশংসার কী হল?

একটা জটিল রহস্যের সমাধান তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।—বৃদ্ধ রহস্যভেদী বাকি কফিটুকু শেষ করে চুরুট ধরালেন। বললেনঃ আসলে অনেকসময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। অবশ্য তফাত শুধু একটা ও-কারের। ও-কার জুড়লেই তো সব জল হয়ে গেল।

আরও অবাক হয়ে বললাম,—কী অদ্ভুত!

অদ্ভুত তো বটেই।—কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেনঃ তবে এবার পিশাচটাকে খুঁজে বের করা দরকার। সেজন্যই ধুমগড়ে ছুটতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে জয়ন্ত, হালদারমশাই পিশাচটার পাল্লায় পড়লে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবেন না। কথাটা যদি দৈবাৎ কিছুক্ষণ আগে তোমার মুখ দিয়ে বেরুত!…

ও-কার রহস্য

রাত এগারোটা নাগাদ ট্রেন থেকে নেমে দেখি ছোট্ট স্টেশন। নিরিবিলি সুনসান চারদিক। আমি ভেবেছিলাম ধুমগড় নাম এবং রাজারাজড়ার রাজধানী ছিল যখন, তখন স্টেশনটা বেশ বড়-সড়ই হবে। কর্নেল আমার মনের খবর কী করে টের পেয়ে বললেন,—আমরা ওল্ড ধুমগড়ে নেমেছি। নিউ ধুমগড় পরের স্টেশন। দূরত্ব তিন কিলোমিটার। ওটা বড় স্টেশন।

বললাম,—তা হলে এখানে নামলেন কেন?

আমাদের টিকিট ওল্ড ধুমগড় অব্দি।

—কিন্তু এখানে তো লোকজন দোকানপাট দেখছি না। যানবাহনও চোখে পড়ছে না।

সেটাই তো সুবিধে।—বলে কর্নেল পা বাড়ালেন!

গেটে টিকিট নেওয়ারও লোক নেই। স্টেশনঘরের ভেতর স্টেশনমাস্টার একলা বসে টরে টক্কা করছেন। উর্দিপরা এক রেলকর্মী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে

সম্ভবত আকাশের তারা গুনছিল। সে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে হনহন করে এগিয়ে এল। ভেবেছিলাম টিকিট চাইবে। কিন্তু সে টিকিট চাইল না। চাপা স্বরে বলল,—এত্তা রাতমে আপলোগ টিশনকে বাহার মাত্ যাইয়ে সাব। খতরনাক হো যায়ে গা।

কর্নেল বললেন,—হাম শুনা ইধার এক পিশাচ নিক্লা। সাচ্?

—সাচ্ বাত্ সাব! দেখিয়ে না, ইয়ে টিশনমে কোই প্যাসিঞ্জার নেহি উতরা। সব আগলে টিশনমে উতরেগা।

—হামলোগ পিশাচ পাকাড়নে আয়া।

—তামাশা মাত্ কিজিয়ে সাব। মেরা বাত শুনিয়ে।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—গভমেন্ট্ হামকো পিশাচ পাকাড়নেকে লিয়ে ভেজা। ইয়ে দেখো, ক্যায়সে হাম উনকো পাকড়ায়েগা!

কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক বের করে কর্নেল বোতাম টিপলেন। স্টিকের ডগায় সূক্ষ্ম সবুজ রঙের জাল ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ল। রেলকর্মী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেল জাল গুটিয়ে স্টিক কিটব্যাগে গুঁজে গেট দিয়ে বেরুলেন।

স্টেশনের পেছনে একটা খাঁ খাঁ চত্বর। তার ওধারে সংকীর্ণ একটা পিচের রাস্তা অব্দি আলো পেঁাছেছে। তারপর গাঢ় অন্ধকার। কর্নেল টর্চ ফেলে বললেন,—তোমার টর্চও রেডি রেখো।

ততক্ষণে আমি টর্চ বের করেছি। বললাম,—কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—বনবাংলোয়।

—সেটা কতদূরে?

—কাছেই।

অস্বস্তি হচ্ছিল। টর্চের আলোয় দুধারে ঘন জঙ্গল আর বড়-বড় পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছিল। কিছুদূর উৎরাইয়ের পর চড়াই শুরু হল। বারবার পিছনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছিলাম। কলকাতার কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে যে পিশাচের অস্তিত্ব অবাস্তব মনে হয়েছিল, এখানে এখন তা একেবারে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—টর্চের ব্যাটারি খরচ করো না জয়ন্ত! আমার ধারণা, পিশাচ শ্মশানের কাছাকাছিই আছে। শ্মশান এখান থেকে দূরে।

একখানে পিচরাস্তাটা ছেড়ে খোয়াঢাকা একফালি পথ ধরলেন কর্নেল। পথটা চড়াইয়ে উঠেছে। ওপরে খানিকটা দূরে আলো জুগজুগ করছিল। এবার দেখলাম, আমরা একটা টিলার ঢাল বেয়ে উঠছি।

একটু পরে সেই আলোটার দিক থেকে কেউ বলে উঠল,—কৌন্ বা?

কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন,—চতুর্মুখ নাকি?

জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর দৌড়ে এল একজন খাঁকি প্যান্টশার্ট পরা লোক। তার একহাতে বন্দুক। বুঝলাম ফরেস্ট গার্ড। সে স্যালুট ঠুকে বলল,—কর্নিলসাব! আপ?

—হ্যাঁ চতুর্মুখ। দয়ারাম আছে তো? নাকি পিশাচের ভয়ে বাড়ি পালিয়েছে?

চতুর্মুখ হাসল,— জি হাঁ কর্নিলসাব। তবে আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি আছি। মাণিকলালভি আছে।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। চতুর্মুখ লোকটি সাহসী বোঝা গেল। তার মতে, পিশাচের সত্যিমিথ্যা সে জানে না। তবে এমনও হতে পারে, গুজব রটিয়ে চোরা শিকারি বা কাঠ পাচারকারীরা এই মওকায় জঙ্গল লুঠবে! তাই রেঞ্জারসায়েব তাদের দুজনকে রাত জেগে নজর রাখতে বলেছেন। উঁচু কাঠের টাওয়ারে লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে দুই বনরক্ষী বসে রাত কাটায়।

টাওয়ারের দিকে ঘুরে চতুর্মুখ চেঁচিয়ে বলল,— মাণিকলাল! কলকত্তাসে কর্নিলসাব আয়া!

সেখান থেকে সাড়া এল,— সেলাম কর্নিলসাব!

বাংলোটা কাঠের তৈরি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, বেশ ছিমছাম সাজানো গোছানো। জানালাগুলো খুলে দিলে হাওয়া খেলতে লাগল। পেছনে নদীর জলের কলকল ছলছল শব্দ। খাওয়া আমরা ট্রেনেই সেরে নিয়েছিলাম। কর্নেল তাঁর প্রিয় পানীয় কফি চিনি, টিনের দুধ এবং কিছু স্ন্যাক্স এনেছেন সঙ্গে। চতুর্মুখ ঝটপট কিচেনে কেরোসিন কুকার জেলে কফি করে আনল।

পিশাচের গল্পটা চতুর্মুখ সবিস্তারে শোনাল এবং আগেই বলে দিল, সবই তার শোনা কথা। দিন চারেক আগে রাজবাড়ির একজন বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মারা পড়ে। তখন রাত প্রায় নটা দশটা। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, হার্টফেল। রাজবাড়ি এখন নামেই। অবস্থা পড়ে এসেছে। দালানকোঠা দিনেদিনে মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়েছে। তো লোকটাকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সব কাঠ ভিজে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। তাই দুজনকে বসিয়ে রেখে বাকি লোকেরা শুকনো কাঠ আনতে গিয়েছিল। তখন বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু বিজলি চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। হঠাৎ লোকদুটো নাকি বিজলির ছটায় দেখে, কালো কী একটা জন্তু দুই পায়ে হেঁটে মড়ার খাটিয়ার কাছে এল। মুখের দু'পাশে দুটো বড়বড় দাঁত। বীভৎস মুখ। লোকদুটো পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে লাঠিশোটা বন্দুক বল্লম টর্চ নিয়ে অনেক লোক শ্মশানে ছুটে আসে। দেখে, খাটিয়ায় মড়া নেই। খুঁজতে খুঁজতে একটু তফাতে জঙ্গলের ভেতর মড়া পাওয়া যায়। কিন্তু পেটের নাড়িভুঁড়ি সবটাই খুবলে তুলে

সেই দুপেয়ে জন্তুটা খেয়ে ফেলেছে। এবার সবাই ধরে নেয়, জন্তুটা পিশাচ। মড়াটা অবশ্য দাহ করা হয়।

পরদিন রাতে রাজবাড়ির বড়তরফ রণজয় সিংহের কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। জানালার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। টর্চের আলো জ্বালতেই নাকি পিশাচটাকে দেখতে পান। ভীতু মানুষ। হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়। পরে চেঁচামেচি করেন। ততক্ষণে পিশাচ উধাও। গুজব এত বেশি রটেছে যে, ধুমগড়ের অনেকেই নাকি পিশাচটা দেখেছে। তাই সন্ধ্যার পর বাজার দোকান-পাট রাস্তাঘাট সুনসান ফাঁকা হয়ে যায়। কেউ নাকি সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে একা বেরোয় না।

ঘটনাটা শুনিয়ে চতুর্মুখ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। তবে সে বলে গেল, পিশাচ না আসুক, নদী পেরিয়ে জঙ্গল থেকে বাঘ-ভালুক আসতেও পারে। কাজেই আমরা যেন দরজা ভাল করে এঁটে শুই।

খবরের কাগজে মোটামুটি ওইরকম বিবরণই বেরিয়েছে। তবে রণজয় বাবুর জানলায় পিশাচের আবির্ভাবের কথা বেরোয়নি। সন্ধ্যার পর সব নিরিবিলি হওয়ার কথাও বেরোয়নি।

কর্নেল দরজা এঁটে জানালার ধারে বসে চুরুট ধরালেন। বললেন,—শুয়ে পড়ো জয়ন্ত!

—আপনি কি পিশাচের জন্য রাত জাগবেন নাকি?

—নাহ্। ধুম্রগড়ের রাজকাহিনীর শেষ কয়েকটা পাতা পড়ে নিয়ে ঘুমোব।

—আর পড়ে কী লাভ? আপনি তো বলছিলেন, একটা জটিল রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন.—তোমারই সাহায্যে হয়ে গেছে।

গোলকধাঁধা শুনে?

—একটা ও-কার জুড়েই সব জল হয়ে গেছে।

—প্লিজ কর্নেল! হেঁয়ালি করবেন না। ও-কারের চোটে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

গোলকধাঁধার গোলকের একটা ও-কার দরকার ছিল। অর্থাৎ গোলোক। রাজবাড়ির যে বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করে মারা গেছে, তার নাম ছিল গোলোক।

—বুঝলুম। গোলোক থেকে কী করে রহস্য ফাঁস হল?

—রাতবিরেতে হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মরে গিয়ে গোলোকই রহস্য ফাঁস করেছে।

—তার মানে?

—ওই শোনো! ফেউ ডাকছে। কাছাকাছি কোথাও বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে চুপ করলাম। সত্যিই ফেউ ডাকছে।…

ধাঁধার জট ছাড়ল

কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমার ঘুম ভাঙালেন। বললেন,—দয়ারামকে সাহস দিয়ে নিয়ে এলাম। চতুর্মুখ আর মাণিকলাল রাত জেগে ডিউটি করে। ওদের ঘুমোনো দরকার।

দয়ারাম বাংলোয় চৌকিদার। সেও খুব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে পিশাচকাহিনী শোনাল। সে জনৈক ফোটোগ্রাফার রামবাবুর কথা বলল। রামবাবু নাকি পিশাচটার ফোটো তুলেছেন। রাতে ওঁর জানালায় পিশাচটা গিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে রামবাবু ক্যামেরায় ফ্ল্যাশবালবের সাহায্যে ছবি তোলেন।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেলের সঙ্গে বেরোলাম। প্রায় এক কিলোমিটার যাওয়ার পর বসতি এলাকা চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে নদী। নদীর ধারে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। টিলার গায়ে একটা কেল্লাও দেখতে পেলাম। কেল্লা আর আস্ত নেই। কেল্লার নীচে দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বিশাল প্রাচীন একটা শিবমন্দির দেখলাম। মন্দিরের ওপাশে ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটাই রাজবাড়ি।

গেট ধসে পড়েছে। দুধারে পামগাছের সারি পুরনো আভিজাত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখতে পেয়ে রোগা এবং পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রঙ এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজবংশের বড়তরফ রণজয় সিংহ।

রণজয়বাবু বললেন,—আপনি দুদিন পরে আসবেন বললেন। তাই চলে এলাম কলকাতা থেকে।

কর্নেল বললেন,—হঠাৎই চলে এলাম। আমার এই তরুণ সাংবাদিকবন্ধু রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়াতে সাহায্য করেছে।

রণজয়বাবুর মুখে বিস্ময় এবং আনন্দ ফুটে উঠল,—কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, খুঁজে পাচ্ছি না কর্নেলসায়েব! চলুন, ঘরে গিয়ে বসা যাক।

—পরে বসা যাবে। প্রথমে আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন!

বৃহস্পতিবার রাতে গোলোক কি মন্দির চত্বরে মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। মন্দির চত্বরে।

আপনার চোখের সামনেই তো ধড়ফড় করতে করতে মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। আমি ওকে ভোরে কলকাতায় আমার ভাইপো সঞ্জয়ের কাছে পাঠাব ভেবেছিলাম। তাই ওকে খুঁজছিলাম। ইদানিং প্রায় দেখতাম সন্ধ্যার পর গোলোক মন্দির চত্বরে গিয়ে বসে থাকত। জিজ্ঞেস করলে বলত, মনে সুখ নেই বড়বাবু। দেবতার কাছে শান্তি খুঁজছি।

—গোলোক বলত?

—বলত বলেই মন্দিরে খুঁজতে গিয়েছিলাম। যেই গোলোক বলে ডেকেছি, অমনি কেন যেন চমকে উঠল। মন্দির চত্বরের ওপর বাড়ির দোতলার ঘরের আলো পড়ে। সব স্পষ্ট দেখা যায়। ওকে চমকে উঠতে দেখে বললাম, কী হয়েছে রে? সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বুক চেপে ধরে পড়ে গেল। তারপর কাটা পাঁঠার মতো ধড়ফড় করতে করতে স্থির হয়ে গেল।

—ডাক্তার এসে কী বললেন?

—হার্টফেল।

—রণজয়বাবু! সত্যিই কি ডাক্তার এসে বললেন হার্টফেল? আমার ধারণা, ডাক্তার বলেছিলেন আত্মহত্যা করেছে গোলোক। পুলিশের ঝামেলার ভয়ে আপনি ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন হার্টফেলের উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে।

রণজয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন,—হ্যাঁ। গোলোক সাইনায়েড-জাতীয় কিছু খেয়েছিল। কোনও কারণে ইদানিং ওর চালচলনে কেমন যেন অস্থিরতা লক্ষ্য করতাম। গত বছর ওর বউ মারা যায়। ছেলেপুলে ছিল না। কাজেই মানসিক অশান্তিই ওর আত্মহত্যার কারণ।

—রণজয়বাবু! আপনারা তো দু'ভাই?

—আমি আর সঞ্জয়ের বাবা ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় ক্যানসারে মারা যায়।

—আপনার কাছে আপনার শ্যালক থাকেন বলছিলেন। কী যেন নাম?

—চণ্ডী।

—চণ্ডীবাবু আছেন?

রণজয়বাবু বাঁকামুখে বললেন,—চণ্ডী কখন আছে, কখন নেই বলা কঠিন। বাউণ্ডুলের স্বভাব। সামান্য যা জমিজমা আছে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু খায়দায় আর টো-টো করে ঘোরে। বয়সের তো লেখাজোখা নেই। অথচ নাবালক থেকে গেল এখনও। ধর্মের ষাঁড় আর কী!

কর্নেল পা বাড়িয়ে একটু হেসে বললেন,—চলুন তাহলে। ধর্মের ষাঁড়টিকে দেখে আসি।

—ওকে পাচ্ছেন কোথায়?

—মন্দিরেই পাব। শিবের বাহন শিব মন্দিরেই থাকা উচিত।

—মন্দিরে তো ওকে—

চলুন তো!

যে বিশাল মন্দিরটার পাশ দিয়ে এসেছি, এবার রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সেখানে ঢুকলাম। চত্বরে গিয়ে কর্নেল বললেন—গোলোক কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল?

উঁচু মন্দিরের সিঁড়ির নীচেটা দেখিয়ে দিলেন রণজয়বাবু,—এই সিঁড়ির ধাপেই বসে থাকত গোলোক।

কর্নেল সিঁড়ির শেষ ধাপে খোলা একটুকরো বারান্দার দিকে আঙুল তুলে বললেন,—ওই তো ধর্মের ষাঁড়। শিবের বাহন।

কথাটা বলেই সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গেলেন। তারপর সেই ধাঁধাটা আওড়ালেন ঃ

পাষণ্ডের পা
কভু ধরিস না
মস্তকে ঘা
কী জ্বলে রে বাবা ॥

রণজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন,—কী ব্যাপার কর্নেল স্যায়েব?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—ষাঁড়ের মাথা কে ভাঙল রণজয়বাবু?

রণজয়বাবু উঠে গেলেন,—সে কী। মাথাটা ভাঙা লক্ষ্য করিনি তো!

কর্নেল বললেন,—ধাঁধার জট ছাড়াতে বলেছিলেন। ছাড়িয়েছি। কিন্তু কোন লাভ হল না।

রণজয়বাবু চমকে উঠে বললেন,—লাভ হল না?

না।—কর্নেল মাথা নাড়লেন ঃ পাষণ্ডের পা কভু ধরিস না। এর মানে হচ্ছে, পাষণ্ড শব্দের পা ধরা হবে না। পা না ধরলে বাকি রইল ষণ্ড। অর্থাৎ কি না ষাঁড়। এবার মস্তকে ঘা। তার মানে, ষাঁড়ের মাথায় ঘা মারতে হবে। ঘা মারলে মাথা ভেঙে যাবে। তারপর বলা হয়েছে, কী জ্বলে রে বাবা! এই জ্বলে শব্দে বোঝায় জ্বলজ্বল করছে। উজ্জ্বলতা। কিসের এই উজ্জ্বলতা? হীরের! মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার জন্য আপনাদের পূর্বপুরুষকে বাদশাহ আকবর যে হীরে উপহার দিয়েছিলেন, সেই হীরে। জন্মেজয় সিংহ বংশধরদের জন্য এই হীরেটা এই ষাঁড়ের মাথার ভেতরে লুকিয়ে রেখে ধাঁধা তৈরি করেছিলেন। ধূম্রগড়ের রাজকাহিনী বইয়ে বাদশাহের দেওয়া হীরের কথা আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তা ধাঁধায় বলা হয়েছে।

রণজয়বাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন—কে ষাঁড়ের মাথা ভাঙল?

—গোলোক ভেঙেছিল।

—কিন্তু হীরে কোথায় গেল?

—গোলোকের পেটে।

—কী সর্বনাশ!

—হ্যাঁ, সর্বনাশ তো বটেই। হীরে সাংঘাতিক বিষ। আপনাকে আসতে দেখে হীরের টুকরোটা গোলোক গিলে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হয়।

—কিন্তু গিললো কেন হতভাগা? লুকিয়ে ফেলতে পারত জামা কাপড়ের তলায়।

—বোকা গোলোক কারও হুকুম পালন করেছিল টাকার লোভে। ওকে

বলা হয়েছিল, ধরা পড়ার উপক্রম হলে যেন সে ওটা গিলে ফেলে। গোলোক জানত না হীরে মারাত্মক বিষ।

রণজয়বাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন—আপাতত এই পর্যন্ত। তবে আশাকরি, আপনাদের বংশের ঐতিহাসিক হীরে উদ্ধার করে দিতে পারব।…

পিশাচ দর্শন

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললাম—তা হলে কলকাতায় বসে ঠিকই রহস্যের জট ছাড়াতে পেরেছিলেন! কিন্তু পিশাচ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

বোঝা যাবে। আগে সেই রামবাবু ফোটোগ্রাফারের দোকানে যেতে হবে। —বলে কর্নেল রাস্তায় একটা সাইকেল-রিকশ ডাকলেন।

বাজার এলাকায় গিয়ে রামবাবুর দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল। দোকানের নাম 'জয় মা কালী স্টুডিও'। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজীতে লেখা সাইনবোর্ড। কর্নেলকে দেখেই বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন,—কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! কর্নেলসায়েব যে! আসুন। পায়ের ধুলো দিন। এবার কতগুলো প্রজাপতি আর অর্কিডের ছবি তুললেন? গত মাসে তো অনেক তুলেছিলেন।

বুঝলুম রামবাবুর স্টুডিওতে কর্নেল ছবি প্রিন্ট করিয়েছিলেন। কর্নেল ভেতরে ঢুকে বললেন,—ছবি এখনও তুলিনি। তুলব। তবে আগে পিশাচ দর্শন করতে চাই। আপনি নাকি পিশাচের ছবি তুলেছেন?

রামবাবুর মুখে ভয়ের ছবি ফুটে উঠল। চাপা স্বরে বললেন,—ভয়ের ঘটনা কর্নেলসায়েব! তবে আমার পেশার লোকদের এই একটা অভ্যাস আছে। আসলে ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করা ছিল। ফ্ল্যাশ ফিট করা ছিল না।

—তাহলে পিশাচ যেন আপনার কাছে ছবি ওঠাতেই এসেছিল!

রামবাবু হেসে ফেললেন,—তা যা বলেছেন স্যার। ফ্ল্যাশ ফিট করে ছবি তুললাম। তখন জানালার ধার থেকে থপথপ করে চলে গেল। বাগানে ঢুকে পড়ল।

পিশাচটা পাবলিসিটি চাইছে আর কী!—কর্নেল হাসলেন: যাই হোক, কই দেখি পিশাচের ছবি।

রামবাবু ড্রয়ার টেনে বললেন,—পুলিশ এসে নেগেটিভটা সীজ করেছে। মোট তিরিশখানা প্রিন্ট বেচেছি। দু'খানা প্রিন্ট পুলিশ নিয়েছে। একখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই থেকে নেগেটিভ করব। মনে হচ্ছে প্রচুর বিক্রি হবে।

রঙিন ছবিটা দেখে শিউরে উঠলাম। জানলার গরাদের বাইরে একখানা ভয়ঙ্কর মুখ উঁকি মেরে আছে। দুখানা সুচোলো কষদাঁত বেরিয়ে আছে। লাল ঠোঁটে চাপচাপ রক্ত। গোরিলা নয়। কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, ক্রোম্যা-

গণনের পরবর্তী কোনও পর্যায়ের নরবানর। বীভৎস ছবি।

কর্নেল আতস কাচে খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—রেখে দিন।

রামবাবু চাপা স্বরে বললেন,—কদিন আছেন তো? একটা কপি আপনার জন্য রাখব।

রাখতে পারেন।—বলে কর্নেল বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় গিয়ে বললাম,—হালদারমশায়ের জন্য ভয় হচ্ছে। ওঁকে খুঁজে বের করা উচিত কর্নেল!

কর্নেল বললেন,—চলো! এবার শ্মশানতলায় যাওয়া যাক। একটু দূরে হবে। রিকশ ডাকি।

কিন্তু কোন রিকশই শ্মশানতলায় যেতে রাজি হল না। শুধু একজন বলল, সে রাস্তার মোড় অব্দি যাবে। দশ টাকা লাগবে। কর্নেল রাজি হলেন।

রাজবাড়ি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তার মোড় এল। রিকশওয়ালা বলল,—ইধার সিধা চলা যাইয়ে।

এবড়ো খেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তার দুধারে জঙ্গল আর টিলা। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছিলেন। আমার ভয় হচ্ছিল, বিরল প্রজাতির কোনও পাখির পিছনে উধাও হয়ে না যান। গেলে পরে আমাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই পিশাচটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলতে দেরি করবে না।

কর্নেল উধাও হলেন না। কিছুক্ষণ পরে আমরা শ্মশানে পৌঁছলাম। চারদিকে ডালপালা ছড়ানো ঝুরি নামানো আদ্যিকালের বটগাছ। তার ওধারে শরৎকালের ভরা নদী। এখানে-ওখানে চিতার ছাই আর ভাঙা মাটির কলসি পড়ে আছে। একপাশে কয়েকটা পাথরের ঘর মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার কাছে একটা পাথরের মন্দির। কতকটা বৌদ্ধস্তুপের গড়ন। খানিকটা ফোঁকর দেখা যাচ্ছে স্তুপে। ওটাই সম্ভবত দরজা ছিল। মাটিতে বসে গেছে। ঝোপেও ঢাকা পড়েছে। বললাম, কর্নেল! পিশাচটা ওই স্তুপের ভেতর থাকে না তো?

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে বটতলায় একটা ঝুরির কাছে গেলেন। তারপর বললেন, এখানে কোনও সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়েছিল দেখছি। ছাইটা টাটকা। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি, মাটি দেখে বোঝা যাচ্ছে। একটা ছোট্ট ত্রিশূল আর—মড়ার খুলি!

কর্নেল খুলিটা কুড়িয়ে নিয়েই ফেলে দিলেন। ঠকাস করে শব্দ হল। হাসতে হাসতে বললেন, প্লাস্টিকে তৈরি নকল খুলি। কাজেই হালদারমশাই ছদ্মবেশী সাধু সেজে এখানে ধুনি জেলেছিলেন, এতে আমি নিঃসন্দেহ।

বললাম,—উনি গেলেন কোথায়?

কর্নেল মাটিতে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে থমকে দাঁড়ালেন। কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন,—একটুকরো জটা! মেড ইন চিৎপুর। পাটের

তৈরি জটা! জয়ন্ত, হালদারমশাইয়ের নকল জটা ছিঁড়ে পড়ার একটাই অর্থ হয়। ওঁকে কেউ আক্রমণ করেছিল।

—সর্বনাশ! তাহলে পিশাচের পাল্লায় পড়েছিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। কিন্তু ওঁর কাছে তো রিভলবার থাকে।

কর্নেল স্তূপটার কাছে এগিয়ে গেলেন। পিঠের কিটব্যাগ থেকে টর্চ বের করে সেই ফোকরের কাছে গুঁড়ি মেরে বসলেন। টর্চ জেলে ভেতরটা দেখেই বলে উঠলেন,—জয়ন্ত। দেখে যাও!

দৌড়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, খটখটে পাথুরে মেঝেয় চামচিকের নাদির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন আমাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হাত এবং পা বাঁধা। মুখে টেপ সাঁটা ছিল। খুলে গেছে। তার চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার, টর্চের আলোয় চামচিকের ঝাঁক ছত্রভঙ্গ হয়ে ওড়াউড়ি করছে। হালদারমশাইয়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। কিন্তু ওঁর সাড়া নেই। অজ্ঞান হয়ে আছেন নাকি?

কর্নেল ডাকলেন,—হালদারমশাই! হালদারমশাই!

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পিটপিট করে তাকালেন। বললেন,—জ্বালাতন! তোরা আমারে ম্যারস্ ক্যান! যা! যা! আবার মারে! চামচিক্যা কি আর সাধে কয়?

—হালদারমশাই! হালদারমশাই!

অ্যাঁ? – হালদারমশাই মাথা ঘোরালেন: হালার পিচাশ? আবার আইছ? একখান দাঁত উপড়্যা ফ্যালাইছি। আরেক খান রাখুম না! কাম অন!

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! এই ছুরি নিয়ে ভেতরে ঢোকো। বাঁধন খুলে ওঁকে বের করে আনো। আমার এই প্রকাণ্ড শরীর ভেতরে ঢোকানো যাবে না।

আঁতকে উঠে বললাম,—বড্ড চামচিকে যে!

—দেরি কোরো না। চামচিকের চাঁটিতে মাথা খুলে যাবে। ঢোকো।

চোখ বুজে ঢুকে পড়লাম। চামচিকের ঝাঁকের চাঁটির পর চাঁটি খেতে খেতে বাঁধন কেটে গোয়েন্দাকে টেনে বের করলাম। তখনও উনি গর্জাচ্ছেন! শাসাচ্ছেন 'পিচাশের' বাকি দাঁতটা উপড়ে দেবেন বলে। আধখানা নকল দাড়ি মুখের পাশে ঝুলছে। জটার খানিকটা আটকে আছে। পরনে লাল খাটো লুঙ্গি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে ঝুলছে। গোঁফের কোণায় সেলোটেপও ঝুলছে। বাইরে বেরিয়ে ওঁর হুঁশ হল। চোখ মুছে বললেন,—হালার পিচাশটা গেল কই?

কর্নেল বললেন,—নদীর জলে মুখ কাঁধ রগড়ে ধুয়ে নিন হালদারমশাই!

হালদারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর খিকখিক করে হেসে বললেন,—কর্নেলস্যার! জয়ন্তবাবু! আপনারা আইয়া পড়ছেন? পিচাশটারে আমি জব্দ করছি! একখান দাঁত—

—নদীতে চলুন হালদরমশাই! গোঁফের পাশে টেপ ঝুলছে। জল না দিলে আটকে থাকবে।

কর্নেল ওঁকে টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন!···

হালদারমশাইয়ের মুখে জানা গেল, কলকাতা থেকে এসে তিনি নিউ ধুমগড়ে একটা হোটেলে উঠেছিলেন। তারপর কাল রাত নটায় শ্মশানতলায় এসে ধুনি জেলে সাধু সেজে বসেন। শেষ রাতে ঘুমের ঢুলুনি চেপেছিল। হঠাৎ পেছন থেকে 'পিচাশটা' ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কিন্তু 'পিচাশের' গায়ে জোর বলেও নয়, বেকায়দায় পড়ে হালদারমশাই বন্দী হন। তাঁকে টানতে টানতে স্তূপের ভেতর ঢোকায় 'হালার পিচাশ'। মুখে টেপ সেঁটে দিয়েছে। চেঁচানোরও জো ছিল না।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! এই অবস্থায় হালদারমশাই হোটেলে ফিরতে গেলে পাগল ভেবে লোক জমে যাবে। এখান থেকে সোজা নাকবরাবর হেঁটে গেলে ফরেস্টবাংলো দেখতে পাবে। ওঁকে নিয়ে গিয়ে তোমার একপ্রস্ত পোশাক পরতে দাও। ওঁর কিছু খাওয়াদাওয়াও দরকার। দেরি করো না। আমি অন্যদিকে যাচ্ছি।

হালদারমশাই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন,—আমার রিভলভার গেল কৈ? আসনের তলায় রাখছিলাম।

'মেড ইন চিৎপুর' নকল বাঘছালের আসনটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কর্নেল বললেন,—পিশাচ আপনার রিভলভারের লোভ ছাড়তে পারেনি।

হালদারমশাই চিন্তিতমুখে বললেন,—ফায়ার আর্মস পিচাশের কোন্ কামে লাগব?

কর্নেল আর কোনও কথা না বলে চলে গেলেন। এর পর হালদারমশাইকে নিয়ে আমি কিভাবে যে বাংলোয় পেঁছুলাম কহতব্য নয়। সারা পথ বুক ঢিপঢিপ করছিল। এই বুঝি পিশাচটা ঝোপের আড়াল থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চৌকিদার দয়ারাম হাঁ করে তাকিয়ে গোয়েন্দা ভদ্রলোককে দেখছিল। বললাম,—শিগগির ওঁকে কিছু খাইয়ে দাও, দয়ারাম। হালদারমশাই আপনি বরং স্নান করে নিন। ওই দেখুন কুয়ো আছে!

দয়ারামের কাছে জানা গেল, কুয়োটা আসলে এই টিলার মাথায় একটা প্রস্রবণ। ওটা ছিল বলেই বনদফতর এখানে বাংলো তৈরি করেছিল।

স্নান করে আমার পাঞ্জাবি-পাজামা পরে হালদারমশাই শুধু দুখানা টোস্ট আর এক কাপ কফি খেলেন। তারপর আমার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন।

কর্নেল এলেন বেলা দুটো নাগাদ। হালদারমশাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন,—আপনার রিভলভারটা উদ্ধার করেছি। এই নিন। উনি কিটব্যাগ থেকে রিভলভার বার করে দিলেন।

অবাক হয়ে বললাম,—কোথায় পেলেন ওটা ?

—পিশাচের ডেরায়। সিন্থেটিক বাঘছালে মোড়া ছিল। বাঘছালটা একই অবস্থায় রেখেছি।

—জায়গাটা আপনি খুঁজে বের করেছেন ?

—হ্যাঁ। পশুপাখি কীটপতঙ্গ সব প্রাণীরই ডেরা থাকে। কাজেই পিশাচেরও একটা ডেরা থাকা উচিত। যাই হোক, এখন আর কোনও কথা নয়। হীরে উদ্ধার বাকি আছে। লাঞ্চ খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরুব।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা বেরোলাম বাংলো থেকে! কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! একটা কথা। দৈবাৎ যদি আমরা পিশাচটাকে জঙ্গলে দেখতে পাই, সাবধান! যেন গুলি ছুঁড়বেন না। তবে রিভলবার বের করে ওকে ভয় দেখাতে পারেন! কিন্তু কক্ষনো গুলি ছুড়ে বসবেন না। পিশাচটাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় ধরতে চাই।

অজানা আশংকায় আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কর্নেল বনবাদাড় ভেঙে হাঁটছিলেন। মাঝে মাঝে পাথরে উঠে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন। বললাম,—কর্নেল! আপনি কি পিশাচের ডেরায় যাচ্ছেন ?

কর্নেল বললেন,—নাহ্‌ শ্মশানতলায়।

—শ্মশানতলায় কেন ?

কর্নেল হাসলেন,—আপত্তি আছে তোমার ? আমাদের সবাইকে তো একদিন শ্মশানে যেতেই হবে। কী বলেন হালদারমশাই ?

হালদারমশাই গম্ভীরমুখে বললেন,—হঃ!

বললাম,—জায়গাটা অস্বস্তিকর। মড়াপোড়ানো ছাইয়ের গাদা। বিশেষ করে চিতার ছাই দেখলেই আমার গা ছমছম করে।

কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন,—কী বললে ? কী বললে ? চিতার ছাই ?

—হ্যাঁ। কিন্তু এতে চমকে ওঠার কী আছে ?

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। হালদারমশাই লম্বা পা ফেলে ওঁকে অনুসরণ করলেন। পিছিয়ে পড়ার ভয়ে আমিও প্রায় জগিং শুরু করলাম।

শ্মশানতলায় পেঁৗছে কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই, দেখুন তো! এলোমেলোভাবে অনেক চিতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে টাটকা চিতা কোন্‌টা হতে পারে ? যতদূর জানি, বৃহস্পতিবার রাতে গোলোকের মড়া পোড়ানোর পর পিশাচের ভয়ে এ শ্মশানে আর কোনও মড়া পোড়োনো হয়নি। নিউ ধূমগড়ের নতুন শ্মশানে সবাই মড়া পোড়াচ্ছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করে দেখতে দেখতে বললেন,—বৃষ্টিবাদলায় সবগুলি হেভি ধুইয়া গেছে। তবে আপনি কার চিতা কইলেন য্যান ?

—রাজবাড়ির স্যারভ্যান্ট গোলোকের। মানে যার মড়ার নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলেছিল পিশাচ।

—তবে তো ওনার চিতার ছাই হেভি হইব। বলে হালদারমশাই লাফ দিয়ে এগোলেন।

—লাস্ট্ বার্নিং কর্নেল স্যার! হেভি অ্যাশ! এই যে।

কর্নেল গিয়ে বৃষ্টির জল থিকথিকে পাঁকের মতো ছাইগুলো ঘাটতে শুরু করলেন। বললাম,—ও কী করছেন?

কর্নেল আওড়ালেন,—যেখানে দেখিবে ছাই / উড়াইয়া দেখ তাই / পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

হালদারমশাইও হাত লাগাতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁকে নিষেধ করলেন! একটু পরে ছাইগাদার তলা থেকে কী একটা জিনিস কুড়িয়ে কর্নেল নদীর ধারে দৌড়ে গেলেন। জলে সেটা ধুয়ে পকেটে ঢুকিয়ে হাসলেন,—জয়ন্ত! শ্মশান-তলায় আসছিলাম পিশাচটার জন্য ওত পাততে। কারণটা পরে বলছি। তবে এবারও তুমি রহস্যের দ্বিতীয় পর্ব ফাঁস করেছ! ধন্যবাদ ডার্লিং! অসংখ্য ধন্যবাদ! হীরে উদ্ধার হয়ে গেল।

—বলেন কী! ওই জিনিসটা হীরে? গোলোকের চিতার ছাইয়ে কে লুকিয়ে রেখেছিল?

—কেউ না। হীরেটা গিলে গোলোক মারা পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাকস্থলীতে হীরে পৌঁছনোর কথা নয়। গলার নলীতেই আটকে যাওয়া উচিত। কারণ হীরে খাঁজকাটা ধাতু।

হালদারমশাই বললেন, কই দেখি!

—পরে দেখাব। এবার পিশাচের জন্য ওত পাততে হবে। বটগাছের আড়ালে চলুন।

বটগাছের ঝুরির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গুঁড়ির আড়ালে তিনজনে বসে পড়লাম। সামনে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ঢালু মাটি নদীতে নেমেছে। এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ দমকা বাতাসে উৎকট গন্ধ ভেসে এল। নাক ঢাকলাম। চাপা স্বরে বললাম,—এ কিসের দুর্গন্ধ?

কর্নেল ইশারায় চুপ করতে বললেন। বেলা পড়ে এসেছে। পাখিরা তুমুল হল্লা জুড়েছে। সামনে একটা পাথরের আড়ালে একটা শেয়াল এসে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রায় জান্তব গলায় কার গর্জন শোনা গেল,—যাঃ! যাঃ! যাঃ! যাঃ!

হালদারমশাই উত্তেজনায় ফিসফিস করে বললেন, পিচাশ! পিচাশ!

এবার পিশাচের শরীরের খানিকটা দেখতে পেলাম। কালো লোমশ শরীর। মুখ এদিকে ঘোরাতেই শিউরে উঠলাম। একটা কষদাঁত সুচোলো হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্যটা হালদারমশাই ভেঙে দিয়েছেন বলছিলেন।

ভাঁটার মতো চোখ। ভয়ঙ্কর মুখ। পাথরটার পাশে সে বসে পড়ল। তারপর বুঝলাম, সে খন্তাজাতীয় কিছু দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। দুর্গন্ধটা বাড়ছে।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন,— তিনজন তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলো।

আগে হালদারমশাই, তারপরে কর্নেল, শেষে আমি গিয়ে পিশাচটাকে ঘিরে ধরলাম। কর্নেল এবং হালদারমশাইয়ের হাতে রিভলভার। পিশাচটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখলাম, সে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

পিশাচটা গর্জন করতেই কর্নেল বললেন,—এক পা নড়লেই খুলি ফুটো হয়ে যাবে।

পিশাচটা নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই হালদারমশাই এক লাফে তার সামনে গেলেন,—হালার পিচাশ! ঘুঘু দেখছ, ফান্দ দেখ নাই!

কর্নেল গিয়ে পিশাচের মুখে চাটি মারার মতো বাঁ-হাত চালালেন এবং হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ যে দেখছি পিশাচের মুখোশপরা একটা লোক।

কর্নেল বললেন,— চণ্ডীবাবু! গোলোকের পাকস্থলীতে খাঁজকাটা হীরে পৌঁছানোর কথা নয়। কাজেই ওর নাড়িভুঁড়ি কেটে তুলে এনে এখানে পুঁতে রোজ একবার করে তা কাটাকুটি করে হীরে হাতড়ানোর মানে হয় না। খামোকা রোজ ওই পচা দুর্গন্ধ জিনিসগুলো ঘাঁটা পণ্ডশ্রম।

হালদারমশাই একটানে কালো লোমশ আবরণ খুলে রণজয়বাবুর শ্যালক চণ্ডীবাবুকে বের করলেন। চকাস করে একটা ছুরিও পড়ল। হালদারমশাই বললেন,—চিৎপুরে কিনাছিল। তবে ছুরিখান রিয়্যাল ছুরি। শৃগালটা গেল কৈ? পচা নাড়িভুঁড়িগুলা শৃগালের প্রাপ্য।

কর্নেল চণ্ডীবাবুর জামার কলার খামচে ধরে বললেন,—চলুন চণ্ডীবাবু! এবার অন্য শ্বশুরালয়ে আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে।

চণ্ডীবাবু হাঁউমাউ করে কেঁদে বললেন, – মাইরি, মা কালীর দিব্যি স্যার! আমি হীরে চুরি করিনি।

– না, না। হীরে নিজের হাতে চুরি করেন নি। ষাঁড়ের মাথা ভাঙার ঝুঁকি নিতে চান নি। গোলোকের হাত দিয়ে কাজটা সারতে চেয়েছিলেন। আপনি ধুরন্ধর চণ্ডীবাবু! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করা উচিত। জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিলেন আপনি। তারপর অনবদ্য আপনার পরিকল্পনা। গোলোক হাতেনাতে ধরা পড়লে পাছে আপনার কারচুপি ফাঁস করে দেয়, তাই আপনি ওকে হীরেটা গিলে ফেলতে বলেছিলেন। তারপর পিশাচ সেজে শ্মশানে ভয় দেখিয়ে লোকগুলোকে তাড়িয়ে গোলোকের নাড়ি-ভুঁড়ি কেটে এনে এখানে পুঁতেছিলেন। পিশাচ যে সত্যিই গোলোকের নাড়ি-ভুঁড়ি খেয়েছে এবং বিশেষ করে সত্যিই এখানে পিশাচের আবির্ভাব ঘটেছে, তা এস্টাব্লিশ করার জন্য শুধু রণজয়বাবুর জানালায় নয়, ফোটোগ্রাফার রামবাবুর জানালাতেও হাজির হয়েছিলেন। আপনি জানতেন, রামবাবু ফোটো না তুলে

ছাড়বেন না তাই অতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতে আপনার পাবলিসিটি হবে। তবে রামবাবুর কাছে আপনার পিশাচমূর্তির ফোটো আতসকাঁচে খুঁটিয়ে দেখেই বুঝেছিলাম, এটা মুখোস মাত্র! তারপর এখানে এসে দুর্গন্ধ টের পেয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে কর্নেল আসামিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার একটা পুলিসের জিপ আসতে দেখা গেল এবড়োখেবড়ো রাস্তায়। জিপ এসে থামল। একদঙ্গল পুলিস বেরিয়ে পড়ল। একজন অফিসার সহাস্যে বললেন—তাহলে আমরা আসার আগেই পিশাচ ধরে ফেললেন কর্নেলসায়েব! শেষ দৃশ্য দেখার সুযোগ দিলেন না।

কর্নেল আসামিকে কনস্টেবলদের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন,—বেলা থাকতে থাকতে পিশাচ এসে মাটি খুঁড়বে জানতাম না। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যা না হলে আসবে না। কিন্তু ওর তর সইছিল না। আপনারা থানায় চলুন। আমর রাজবাড়ি হয়ে থানায় যাব।

পুলিসের গাড়ি চলে গেল।

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কর্নেলস্যার! হালপিচাশের ডেরা—হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস?

কর্নেল হাসলেন,—রাজবাড়িতেই রাজবাড়ির শ্যালকের ডেরা থাকা কি স্বাভাবিক নয়? রণজয়বাবুর কাছে ওঁর শ্যালকের ঘরের চাবি ছিল না। আমার কাছে সবসময় মাস্টার কী থাকে। তাই দিয়ে খুললাম। আপনার বাঘছালে মোড়া রিভলবার পেলাম। কয়েকটা চিঠি পেলাম। কলকাতার এক জুয়েলার কোম্পানি হীরে কিনতে চেয়েছিল। তাদের গতকাল এখানে পৌঁছুনোর কথা। নিউ ধুমগড়ে হোটেল প্যারাডাইসে তারা অপেক্ষা করবে। দুপুরে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলাম। তাদের সঙ্গে চণ্ডীবাবু লাঞ্চ খাচ্ছিল ডাইনিং হলে। সেখান থেকে ভাগ্যিস বাড়ি ফেরেনি। তাহলে ঘরে ঢুকে সব টের পেয়ে সাবধান হয়ে যেত। যাক্ গে। রণজয়বাবু অপেক্ষা করছেন। হীরেটা তার হাতে পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেল,—হীরেখানা একবার দ্যাখাইবেন না কর্নেলস্যার?

কর্নেল কপট গাম্ভীর্যে বললেন,—চোখ জ্বলে যাবে। ধুম্রগড়ের রাজ-কাহিনীর ধাঁধায় বলা আছে ঃ

পাষণ্ডের পা
কভু ধরিস না
মস্তকে ঘা
কী জ্বলে রে বাবা॥

হালদারমশাই আনমনে বললেন,—হঃ! বুঝছি।

কী বুঝলেন তা অবশ্য বললেন না।…